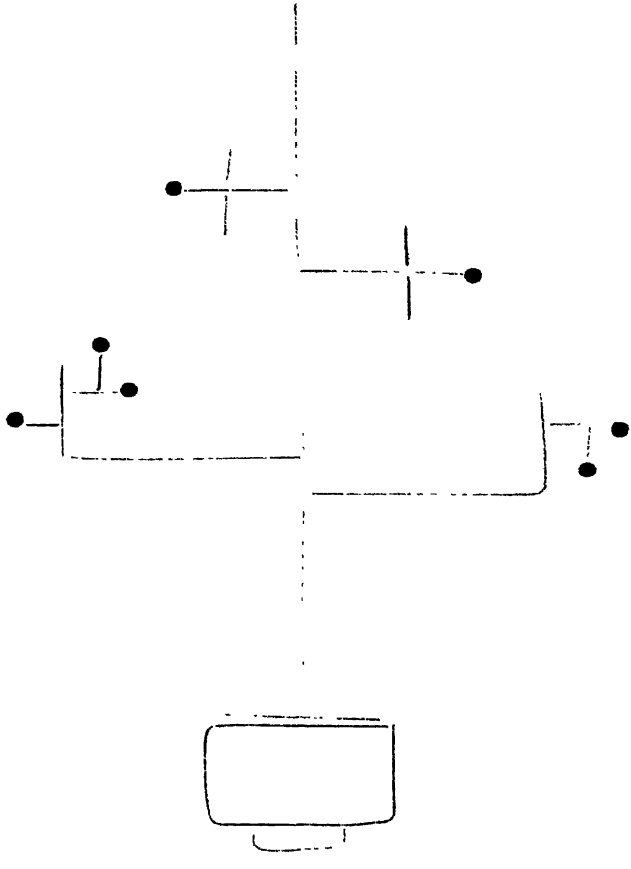

টা কা গা ছ

টাকা গাছ

লীলা মজুমদার
ও
জয়ন্ত চৌধুরী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিকাতা - ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন,
১৮৮৩ শকাব্দ

১·৭০
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা :
অনিল ভট্টাচার্য

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

মামা ওয়ারেরকারকে—

লাল বাড়ির কোণায় রকের ওপরকার ঘুপসি ঘর থেকে পুরোনো বইএর দোকানের মালিক শম্ভু ডেকে বলল,

"কিগো, ওকে লজ্জা দিয়ে এখন মনটা খুব ভালো লাগছে ?"

কানু বইয়ের দোকানের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। মাথায় মুখে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল। তারপর বকুলতলা থেকে জুতো পালিশের বাক্সটা তুলে এনে বইয়ের দোকানের তলায় গুঁজে রাখল।

শম্ভু আবার বলল,

"মুখটা হাঁড়ি কেন ? এসো, উঠে এসো, নতুন বই এনেছি, দেখবে না ?"

কানু বললে,

"নতুন না ছাই ! যত রাজ্যের পুরোনো ছেঁড়া বই !"

তবু চটটাতে নোংরা পা মুছে উঠে বসল।

বেশ দোকানটা। ওখানে বসলে ফুটপাথটাকে অন্যরকম দেখায়। ভিজে বকুল ফুলের সোঁদা গন্ধ নাকে আসতে লাগল। এক তাল নতুন বই মাদুরের ওপর ছড়ানো, সারাদিন ধরে পাতলা তেলা কাগজ আর আঠা দিয়ে শম্ভু তাদের খোলা পাতা জুড়েছে। একখানি তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরে একটু শুঁকল কানু।

কেমন যেন অদ্ভুত একটা গন্ধ। শুকনো পাতা না ফুল না কিসের যেন। বোধ হয় বনের গন্ধ এমনি হয়। বন দেখেনি কানু, তার গন্ধ জানবে-কোত্থেকে ?

শম্ভু বললে,

"খেয়েছ কিছু ?"

বলে মুড়িওলার কাছ থেকে কেনা, তেলেভাজা নরম নরম ছোলা, মটর, কাঁচা পেঁয়াজ আর লাল লাল কাঁচা লঙ্কার কুচি দিয়ে মাখা ঠোঙা-ভরা মুড়ি এগিয়ে দিল।

কানু সেদিকে না তাকিয়ে বই নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। বই খুলতেই মাঝখানের একটি জায়গা থেকে টপ্ করে একটি গাছের পাতা খসে পড়ল। অদ্ভুত পাতাটা, মাঝখানে কুচকুচে কালো শক্ত সরু বোঁটা, দুধারে পাতলা ছোট ঝুরো-ঝুরো পাতা, পাতার উল্টো পিঠে বিচির মতো দাগ, অদ্ভুত গন্ধটিও তারি।

প্রথম পৃষ্ঠায় যেখানে নাম ঠিকানা থাকে, সেটি কে কেটে বের করে দিয়েছে। বেশ পরিষ্কার বই, পরিষ্কার না হোলে পুরোনো বই লোকে কিনবে কেন। বইএর নাম প্রকৃতি পরিচয়। কানু পড়তে পারে কিন্তু সব মানে বোঝে না। শম্ভু তো একটা পুরোনো বইএর দোকান-দার, তাকে জিগ্‌গেস করতে অপমান লাগে। গবারা তো শম্ভুকে নিয়ে হাসাহাসি করে। নাকি এক পয়সা খরচা করতে ওর একটা করে পাঁজরা খসে যায়, কেপ্পনের জাস্থ নাকি শম্ভু।

ছবিতে ভরা বইটা, গাছপাতা, ফুল ফল, পোকামাকড় প্রজাপতির ছবি। বই বন্ধ করে শম্ভুকে জিগ্‌গেস করে,

"কোথায় পেলে এত সব বই?"

বলে একমুঠো মুড়ি তুলে নেয়। তত কেপ্পন হলে শম্ভু কি আর ওকে যেচে খাওয়াত? শম্ভু বললে, "তেওয়ারি বেচেছে সব কটি পঞ্চাশ নয়া পয়সা দিয়ে।"

বই রেখে লাফিয়ে ওঠে কানু। তেওয়ারি বেচেছে? তবে তো ঐ ছেলেটির বই হবে! হাতের মুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নেমে পড়ে ফুটপাথে। শম্ভু ব্যস্ত হয়ে ওঠে,

"কি হল কানু? গলায় লঙ্কা লাগল নাকি? জল খাবে?"

কানু কোনো উত্তর না দিয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড়তে লাগল, ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, পেছলা ফুটপাথে খালি পায়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ হচ্ছে, আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, তবু কানু পালাবার পথ পায় না।

পথের ধারের গ্যাস বাতির আলোয় হঠাৎ দেখে নিজের ছায়া পাঁচগুণ মস্ত হয়ে ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে !

তাই দেখে থেমে গেল কানু। কান বোঁ বোঁ করছে, বুক ঢিপঢিপ করছে, সর্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ সরে গেছে, চাঁদ উঠেছে।

কানু ছাড়া কোনো বাঙালী ছেলে ও-পাড়াতে জুতো পালিশ করে না, বাবুরা অনেকেই তাই কানুকে দিয়ে কাজ করায়, দিন গেলে দশ বারো আনা কামায় কানু। নিজের প্যাণ্ট গেঞ্জি নিজে কেনে, বাঁশতলা কেবিনে দুবেলা ভাত কিনে খায়। লালবাড়ির পিছনে খোলা টিপকল আছে, সেখানে রোজ রাতে স্নান করে। দোকানের ওপরের তক্তায় মাদুর পেতে শম্ভু শোয়, স্নান সেরে তার নিচে দেয়াল ঘেঁষে, মাদুর পেতে, কানু ঘুমোয় মাথার কাছে জুতো পালিশের বাক্স নিয়ে। কানু কারো ধার ধারে না।

বকুলগাছটাতে বারো মাস ফুল ফোটে, মোড়ের মাথার পানের দোকানে সন্ধ্যে লাগতেই নিয়ন বাতি জ্বলে, পেছনের দেয়ালে বড় আর্শিতে তার ছায়া পড়ে, দু' পয়সা দিলে কেয়া খয়ের দেওয়া ছাঁচি পান পাওয়া যায় সেখানে।

গায়ের জল ঝেড়ে কানু ফিরল আবার। নাড়ুগোপাল এখন কি করছে ?

ভিজে গায়ে কেমন শীত-শীত করতে লাগল। বইগুলো নিশ্চয় ওর। বোধ করি ইস্কুলে উঁচু ক্লাসে উঠে পুরোনো বই বেচে দিয়েছে। যশোদা নৈশ বিদ্যালয়ে পড়েছিল কানু, ওসব ওর জানা আছে। কিন্তু না, ও বেচে নি, পঞ্চাশ নয়া পয়সা দিয়ে ওর কি হবে ? দিয়ে দিয়েছে নিশ্চয় তেওয়ারিকে, তেওয়ারি বেচেছে। ওর মা ওকে নতুন বই খাতা কিনে দিয়েছে। ওদের কি ? দিলেই হল। একদিন ওর

পকেট থেকে একটা গোটা আট-আনি পড়ে গেছল, সেটা খুঁজতে আসে নি পর্যন্ত, তেওয়ারিকেও পাঠায়নি। বোধ হয় টেরই পায় নি আট-আনা হারিয়েছে। কানু সারাদিন লোকের ময়লা জুতো পরিষ্কার করে আট দশ আনা রোজগাব করে। আট-আনিটা তুলে রেখেছিল কানু, রাতে বাঁশতলা কেবিনের সামনে ট্রাম লাইনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার ওপর দিয়ে একটা ট্রামগাড়ি চলে গিয়ে চ্যাপটা বানিয়ে দিল, আর আট-আনি বলেই চেনাই যায় না! পুঁটিরামদের দেখিয়েছিল সেটা, তারা তো রেগে টং।

"তুই না নিতে চাস, আমাদের দিলিনে কেন, বেশ বিড়ি কিনতাম।"

পুঁটিরামরা বিড়ি খায় ফালতু পয়সা পেলেই। বলে বিড়ি খেলে আর অত ভাত লাগে না। কানুও মাঝে মাঝে খায়। নাড়ুগোপালকে দেখিয়ে দেখিয়ে খায়। ছোট ছেলেকে বিড়ি খেতে দেখে নাড়ুগোপাল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। পানের দোকানের পাশের দোকানে বড় বড় কাঁচের বোতলে কাঠির আগায় ল্যাবেঞ্চুস থাকে, তেওয়ারির সঙ্গে গিয়ে ঐ কিনছিল সে। ঐ সব খায় ওরা। পাতলা কাগজে মোড়া বিস্কুট খায়. খোলা জিনিস কখনো কেনে না। তেওয়ারি বলে নইলে ওর মা নাকি রাগারাগি করে।

ততক্ষণে লালবাড়ির ফটকের সামনে পৌঁছে গেছে কানু। ভিজে সপ সপ করছে গেঞ্জি প্যাণ্ট. ওদের মটরগাড়ি বেরুচ্ছে, তাই দাঁড়াতে হল।

গাড়ি চালাচ্ছে ওর বাবা, তার হাতে সোনার হাতঘড়ি। ও বসেছে তার পাশে, পরেছে আবার চকচকে সার্ট আর নীল ইজের। ওর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে, পেছনে যারা বসে রয়েছে, তাদের দিকে চেয়ে রইল কানু।

ওদের ও চেনে, ওর মা আর ছোট বোন।

ওর মা-টা কি ফর্সা আর ঠোঁট দুটো যেন সব সময় হাসছে।

ও ঘাড় ঘুরিয়ে মার দিকে চেয়ে কি যেন বললে। বাঁ হাতটা জানলার আধখোলা কাঁচের ওপর দিয়ে বাইরে বার করে কি যেন বোঝাতে চাইলে, দেখাতে চাইলে। মা চট্ করে একবার কানুর দিকে তাকিয়েই ওকে থামিয়ে দিলেন ইসারায়।

ওঃ, ভারি বয়েই গেল কানুর। বলুক না! মা'র কাছে করুক না যত খুশি নালিশ, কানু তো পরোয়া করে থোড়াই! এই তো চুপচুপে ভেজা গেঞ্জি আর ইজের পরে, এলোমেলো একমাথা চুলে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কানু, কি হল? জলের ছাঁট আসবার ভয়ে জানলার কাঁচটা আবার তুলে দিচ্ছে! তাই দে, তাই দে, নইলে গলে যাবি শেষ কালে! আর কাগজে মোড়া মিষ্টি মিষ্টি ল্যাবেঞ্চুস খা!

ততক্ষণে রাস্তার মোড়ে ওদের গাড়ির পেছন দিককার ছোট্ট লাল আলোটা দেখা যাচ্ছে। কানু আবার চলা শুরু করে, আর আবার মনে হয় কে যেন ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।—কে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে?

২

বাঁশতলা কেবিনে এলুমিনিয়ামের কানা-তোলা থালায় ভাত খেতে খেতে কানু ভাবে এবার থেকে যেমন করে হোক কিছু পয়সা জমাতে হবে।

মাথাটা কেমন ভার ভার ঠেকে, একটু একটু গা শিরশির

করে। আজ শোবার সময়ে গায়ে একটা কিছু চাপা দিতে পারলে ভালো হোত। চাইলে শম্ভু হয়তো দেবে ওর ছেড়ে-রাখা ধুতিটা। কিন্তু ও নেবে না। ঐ নাড়ুগোপাল ঘুমোক লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে।

—"কানু, আর ভাত নিবি ?"

হোটেলের বুড়ো বামুনের কথায় কানু মুখ তুলে তাকাল।

—"একি রে, ভাত যে পড়ে রইল এখনো পাতে? আমি ভাবি কি, ঠাণ্ডার রাতে কানু সর্দার আমাদের চেটেপুটে পাত খালি করে বসে আছে।"

কানুর যেদিন সকাল সকাল খিদে পায়, খেতে বসে চাইলেও ওরা বাড়তি ভাত দিতে চায় না, পাছে পরের খদ্দেরদের না কুলোয়। আজ বেশ রাত হয়েছে, তাই ওদের এতো আদর—কানু আর ভাত নিবি? কে চায় ওদের আদর! কানু থালা ঠেলে উঠে পড়ে, মশলাও নেয় না। পকেটে পয়সা ছিল, ছাঁচি পানও কেনে না।

আজ রাতটা কেমন কাটবে কে জানে ?

এক এক দিন শোবামাত্র ঘুম আসে, চোখ খোলে সেই সকালে, শম্ভু যখন হাঁক দেয়। এক-এক দিন চোখের দু' পাতা এক করতে পারে না। আজও বোধ হয় তাই হবে! সারারাত শুয়ে শুয়ে কানু আকাশ-পাতাল ভাববে, চোখ বুঁজলেই এলোমেলো স্বপ্ন দেখবে, লোকের ভিড়ে কানু যেন ঠাঁই পাচ্ছে না, এমনি ধারা কত কি!

উস্‌খুস্ করবে কানু, শম্ভু হয়তো বলবে.

"কি হল রে কেনো? কত বলি মোড়ের দোকান থেকে বেশ এক ভাঁড় গরম মাখন-তোলা দুধ খেয়ে শো, কেমন ঘুম না আসে দেখব—তা তো কানে তুলবি নে!"

শম্ভু জেগেই ছিল, কানু আসতে আরাম করে পাশ ফিরতে ফিরতে বললে,—"দরজাটা ভেজিয়ে রাখিস রে কানু, সারারাত জোলো জোলো হাওয়াটা খাসনি।"

শম্ভু কেমন চট্ করে ঘুমিয়ে পড়ে, এই কথা বললে, আর এই ওর নাক ডাকছে।

বাইরে আকাশটা ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। দূরে কোথাও মোটর গাড়ীর হর্ন, কাছে কোথায় যেন রিক্‌শা গাড়ীর ঘন্টির টুং টাং শব্দ আর সেইসব শব্দের ওপরে পর্দার মতো ঘিরে রয়েছে বৃষ্টির ঝুপ্ ঝুপ্, টুপ্ টাপ্!

আস্তে আস্তে চোখের পাতা ভারী হোয়ে আসতে লাগলো, শিরশিরে হাওয়ায় গুড়িসুড়ি হোয়ে পাশ ফিরে শুলো কানু, আর অমনি ওরা আসতে লাগলো—সেই সব স্বপ্নরা!

শম্ভুর ডাকে যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন ঝাড়ুদাররা রাস্তা পরিষ্কার করে চলে গেছে, উনুনের ওপর বসানো নল বার-করা পেতলের কলসিতে গরম চা, ঝোলাতে মাটির ভাঁড় আর টিনের বাক্সতে গোল গোল নরম নোন্‌তা বিস্কুট নিয়ে চা-ওলা ফুটপাথের কোণে এসে বসে গেছে। কানু যখন চোখ চাইলো শম্ভু তখন চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে। তাই দেখেই কানু তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠেই একছুটে টিপকল থেকে মুখ ধুয়ে ফিরে এসে বসলো চা-ওলার সামনে। গবা, মাণিক ওরাও কেউ কেউ এসেছে এর মধ্যে। চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবার হাঁড়িমুখ, চোখগুলো ফুলো-ফুলো, কথা কয় না কেউ। চা খেতে খেতে কানু ওদের মুখের দিকে তাকায় আর ভাবে, রাত্তিরে ঘুমের ভেতর কত লোককে দেখে, তারা তো পুঁটিরামও নয়,

মাণিকও নয় কেউ ? তবে তারা কে ? স্বপ্নের মধ্যে তো তারা ওর খুব চেনা হয়ে যায়, যেন কতো দিনের চেনা। কিন্তু কৈ, গবা, পুঁটিরাম, মাণিক—এরা ছাড়া আর কাউকে তো সে চেনে না ! তবে মনে মনে কানু ভালো করেই জানে ওরা কে। ওরা হল সব বড়লোক। ভালো জামা কাপড় পরে, ভালো খায়, পয়সা দিয়ে বই-খাতা কিনে দিনের বেলাকার ইস্কুলে যায়। ওদের সকলের বাড়ি আছে, মা-বাবা আছে, লোকের বাড়িতে ওদের নেমন্তন্ন হয়, রোজ বিকেলে পাড়ার ক্লাবে খেলতে যায় ওরা। ওরা যেসব টিন কাগজ শিশি বোতল ফেলে দেয়, গবা সে- সবপয়সা দিয়ে কিনে আনে। ওদের নোংরা জুতো পালিশ করতে পারলে কানু বর্তে যায়। পুঁটিরামরা ওদেরি পকেট কাটে। সত্যি কথা বলতে কি কানু ওদের ভালো করেই জানে।

ততক্ষণে চা শেষ হয়ে গিয়েছিল, ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিলে কানু।

ফুটপাথের ধারে খানিকটা গোল মতন জায়গায় সিমেন্ট নেই, মাটি বের করা। তার চারিদিকে এককালে লোহার ঘের দেওয়া হয়েছিল, তার কিছু কিছু এখনো আছে। সামনের পানওলাটা তারি একটা লোহার শিকের সঙ্গে আগুন-জ্বলা নারকোল দড়ি ঝুলিয়ে রাখে; লোকেরাও পান খেয়ে ওরি গায়ে চুন পুঁছে রাখে। এই বেড়ার মধ্যে কোনো গাছ কোনো দিন দেখেনি কানু, আজ চায়ের খালি ভাঁড়টা নর্দমায় না পড়ে সেই বেড়ার মধ্যে গিয়ে পড়তেই কানু লক্ষ্য করে দেখলে বর্ষার জল পেয়ে সেই মাটিতে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, আর তার ডগায় নোলকের মতো ঝুলছে কাল রাত্তিরের বৃষ্টির জলের ফোঁটা। কচি কচি সবুজ ঘাসগুলোকে দেখে কানুর মনে হোল গিয়ে ওদের গায়ে হাত বুলোয়। হঠাৎ কি খেয়াল

হোতেই চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে দোকানের দিকে যেতে যেতে কানু বললে,—"মান্‌কে, পুঁটে, যাস্‌নি, কাজ আছে।"—তারপর শম্ভুর দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ে মাদুরের ওপর ধপ্ করে বসে বেঞ্চির তলায় কি যেন খুঁজতে লাগল।

—"কী হারাল গো কানুবাবু?" শম্ভু মুচ্‌কি হেসে জিগ্‌গেস করে।

—"না, কিছু হারায়নি," তারপর আরো খানিকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে,—"কালকের সেই বইগুলো কোথায় গো?"

—"তাই বলো, তা ওখানে খুঁজে কি হবে, সে তো তাকের ওপর তুলে রেখেছি।"

—"দেবে একটু সেই গাছ-পালা আর প্রজাপতির ছবিওলা বইখানা?"

—"কেন বল্‌তো, পড়বি না-কি?"—বলতে বলতে শম্ভু "প্রকৃতি-পরিচয়" খানা নামিয়ে কানুর হাতে দেয়। আর কানু অমনি ফর্ ফর্ করে সবকটা পাতা ওল্‌টাতেই তার মধ্যে থেকে সেই গাছের পাতাটা মাটিতে পড়ে যায়—সেই যার মাঝখানে কুচকুচে কালো শক্ত সরু বোঁটা, দুধারে পাতলা ঝুরো-ঝুরো পাতা আর পাতার উল্‌টো দিকে বিচির মতো কালো-কালো দাগ। বইটা ছুঁড়ে দিয়ে পাতাটা তুলে নিয়ে কানু বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

মনে মনে হাসিও পায়, হয় নাকি কখনো শুকনো মরা পাতা থেকে গাছ। ঐ বইয়েতে লিখেছে এই গাছের ফুল হয় না, পাতার পেছনে ঐ কালো দাগ থেকেই নতুন গাছ হয়। গাঁজা নাকি? কিন্তু পুঁতে দেখলেও হয়, বইয়েতে লিখেছে যখন।

ছাপা কথার ওপর কানুর ভারি ভক্তি। শম্ভু বলে নাকি শুধু ঐ কথা দিয়েই হয় তফাৎ। নইলে বড়লোক গরীবলোক কিছু নয়। আজ

যে বড়লোক কালকেই সে গরীব হয়ে যায়। কিন্তু লেখার কথা মনের মধ্যে একবার গেঁথে নিতে পারলে আর কেউ তাকে নিয়ে নিতে পারে না। কি একটা ছড়াও বললে শম্ভু। বললে, ওর বাবার বাবা নাকি বেজায় বড়লোক ছিলেন। ব্যবসা করে আর জুয়া খেলে সব খুয়োলেন। একদিন যাদের সবাই খাতির করত, তাদের সবাই ঘেন্না করতে লাগল। তাই নাকি ওরা ওদের দেশ ঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিল। এইখানেই নাকি বড়লোকরাও যেমন গরীব হয়ে যায়, গরীব লোকরাও তেমনি বড়লোক হয়ে যেতে পারে।

কানু বলেছিল,

"ছ্যাৎ! গরীবরা আবার বড়লোক হয় নাকি? তারা মটর গাড়ি চেপে হাওয়া খেতে যায়? তাদের মা-রা হাত-ভরা সোনার চুড়ি পরে নাকি কখনো?"

শম্ভু তখন একটা আশ্চর্য কথা বললে,

"তা পারে না? এই যে লাল বাড়ির সুন্দর ছেলেটাকে অত হিংসে করিস, ওর বাবার ঠাকুরদা কি করত তা জানিস? জাহাজ কোম্পানির মাল গুণে দিত। সারাদিন তাই করত, আর রাতে একটা তেলের কুপি জ্বেলে পড়াশুনো করত। সময় পেলেই বাজার ঘুরে জিনিসপত্রের দর দেখত। বিড়ি খেয়ে আর গালিগালাজ করে তোদের মতো সময় কাটাত না।"

তবু কানুর বিশ্বাস হয় না।

"হ্যাঃ! এই বাড়িতে থাকত, আবার গরীব ছিল না আরো কিছু!"

শম্ভু খুব হাসে। তখন এই বাড়িতে থাকত কি আর। এই বাড়ি তৈরীই হয় নি তখন, এখানে একটা বাজারের মতো ছিল। সে থাকত বড়বাজারের একটা সরু গলিতে, একটা অন্ধকার ঘরে।

কানু বলে,

"বল, তারপর কি করে ওরা বড়লোক হল ? বই পড়লেই বড়লোক হয় ? তুমি তো দিনরাত বই ঘাঁটো, কই, তুমি বড়লোক হচ্ছ না কেন ?"

শম্ভু আরো খানিকটা হাসে।

"আরে, আমাদের যে বড়লোকির দিন পার হয়ে গেছে। একজনরা সব সময় বড়লোক থাকবে, আরেকজনরা কখনো বড়লোক হবে না, তাই কি হয় ? তবে শোন্, ওরা কি করে বড়লোক হল। ঐ ছেলেটার বাবার ঠাকুরদা আস্তে আস্তে মাল গোণা ছেড়ে, জাহাজে মাল যোগাতে শুরু করে দিল। ক্রমে ক্রমে নামডাক, টাকা সব হল। সেই বাজারটা কিনে নিল ; তবে বাড়িটা আর করে যেতে পারে নি ! টাকা রেখে গেছল, ওর ছেলে এই বাড়ি করল। এখনো ওদের জাহাজের মাল যোগাবার ব্যবসা থেকে এত্ত এত্ত টাকা রোজগার হয়। তবে খুব খাটতে হয় ওর বাবাকে। না খাটলে কেউ কখনো বড়লোক হয় না। যখনি হিংসে হবে তখনি এসব কথা মনে করিস্।"

কানু বললে,

"খাটলেই বড়লোক হয় ? তবে মুংলী গরীব কেন ! রোজ আমার কাছে পয়সা চায়, জানো ?"

শম্ভু বইএর গোছা তুলতে তুলতে বললে, "শুধু খানিকটা গায়ের জোর খাটালেও হয় না। তবে তো রাস্তার ষাঁড়গুলোও বড়লোক হত। মুংলীটা দুটো পয়সা পেলেই গিয়ে তাড়ির দোকানে ঢোকে দেখিস না, বড়লোক হওয়া ওর কম্ম নয়।"

কানুর ভারি আশ্চর্য লাগে,

"তা হলে কারা বড়লোক হয় বল।"

কপালে একটা হাত ঠেকিয়ে শম্ভু বলে, "এইখেনে যাদের লেখা থাকে, শুধু তারাই বড়লোক হয় রে, কানু ! দেখছিস না এত পড়ে

পড়েও আমি বড়লোক হচ্ছি না! তবে তুই হলেও হতে পারিস্, তোর কপালের লেখা পড়বার বিদ্যে তো আর আমার নেই, থাকলে একবার পড়ে দেখতাম।"

ঠাট্টাই করে, না সত্যি বলে শম্ভু, কানু বুঝতে পারে না। কিন্তু বড়লোক হবার জন্যে প্রাণটা আঁকু-পাঁকু করতে থাকে। সব করেও শেষটায় যদি কপালে লেখা নেই বলে বড়লোক হওয়া না হয়, তবে তো বড় মুশকিলের কথা।

শম্ভু বলে,

"হ্যাঁরে বড়লোক হলে তুই কি করবি বল দিকিনি।"

কানু তখুনি বলে,

"জুতো পালিশের বাক্সটাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে, একটা ভালো ছিপ কিনে আমতলার বড় পুকুরে সারাদিন মাছ ধরি। তুমি কি কর?"

শম্ভু বকুলগাছের দিকে চেয়ে বলে,

"দেশে ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো বাড়িটাকে আগাগোড়া সারাই। বাগান থেকে আগাছা তুলে ফুলের গাছ, ফলের গাছ পুঁতি। নতুন করে বেড়া বাঁধি।"

কানু শম্ভুর খুব কাছে এসে বলে,

"সত্যি আছে নাকি তোমার মস্ত পুরোনো বাড়ি? তবে এখানে রকের কোণায় এই খুপরির মধ্যে থাকো কেন?"

শম্ভুর মুখটা কালো হয়ে যায়,

"থাকি কি আর কম দুঃখে রে কানু। ওবাড়ি রাখবার মতো পয়সা কই? একবারটি যদি কেউ আমাকে এক হাজার টাকা দিত, এক্ষুণি চলে যেতাম, দুটো লোক লাগাতাম, জিনিসপত্র কিনে নিজের হাতে বাড়ি সারাতাম, বাগান করতাম।

কি শক্ত খোল রে বাড়িটার কানু, এত দিনের অযত্নেও একটুকু টস্কায় নি। তবে দরজা জানলাগুলো ঝুলে পড়েছে। অনেক টাকার দরকার। এই এক হাজারের চেয়েও বেশী। লোকে আমাকে কেপ্পন বলে তা জানিস, কানু?"

কানু বিলক্ষণ জানে, পুঁটিরাম তো দিনরাত সেই কথাই বলে। শম্ভু বলেই চলে,

"জানিস্ একটা পয়সা খরচ করলে, আমার তক্ষুনি মনে হয়, ঐ আমার বাড়ি সারানো পাঁচ ঘণ্টা পেছিয়ে গেল! প্রাণ ধরে তাই খরচ করতে পারি নে।"

কানুর বুকের মধ্যে থেকে কি একটা শক্ত জিনিস যেন ঠেলে বেরুতে চায়। বলে,

"বাড়ি সারিয়ে সেখানে একা একা থাকবে? তোমার ময়লা কাপড়, ওরকম বাড়িতে তোমাকে থাকতে দেখলে, কেউ তোমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো?"

কি রকম করে যেন হাসে শম্ভু, মনে হয় কাঁদছে।

"দূর পাগল, আমার মতন লোক কি আর অমন বাড়িতে থাকতে পারে? শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধানো ঠাকুর ঘরটা রে কেনো, লাল নীল বিলিতী নক্‌শা-কাটা কাঁচ দেওয়া তার জানলায়, টানা বারান্দা, সামনে পুকুর, পেছনে আম-কাঁঠালের গাছ—একটু চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলে—দোতলায় উঠবার সিঁড়িটা ভেঙ্গে গেল গত বছর।

নিজে থাকব নারে, সারিয়ে ভাড়া দিয়ে দেবো। বাগানের কোণায় গোয়াল-ঘর আছে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে গেছে এখন, তারি একটাতে থাকব।"

কানু অবাক হয়ে খানিক চুপ করে থাকে। তারপর বলে,

"দেখ, আমার এক হাজার টাকা থাকলে তোমাকে দিয়ে দিতাম।

আচ্ছা, লাল বাড়িতে গিয়ে চাও না কেন? তেওয়ারির সঙ্গে তো তোমার বড্ড ভাব, বললেই তোমাকে ওর বাবুর কাছে নিয়ে যায়। এক্ষুণি হাজার টাকা পেয়ে যাও।"

শুনে, শম্ভু সোজা হয়ে বসে, কর্কশ গলায় বলে,

"ভিক্ষে-করা টাকায় আমার বাপ-ঠাকুরদার বাড়ি সারাতে বলছিস্, কেনো? তাঁরা তা হলে ভূত হয়ে নেবে আসবেন না ভেবেছিস্ নাকি? তবে তোর টাকা থাকলে নিতাম, তাতে কোনো দোষ হত না।"

৩

শম্ভুর রাগ দেখে, সেখান থেকে সরে পড়েছিল কানু। শম্ভুদার তো ভারি নবাবি! ঘর সারাবেন, তাও ভিক্ষে করা টাকা দিয়ে নয়। কেন রে বাপু, কে তোকে অতগুলো টাকা দিচ্ছে শুনি? প্রত্যেক রবিবার তিনকড়ির দলে ভিড়ে গবাটা ভিক্ষে করতে বেরোয়। বেশ দু' পয়সা কামায়ও ঐ করে। মাঝে মাঝে ওদের এতোয়ারি ভোজ খাওয়ায়, দোকান থেকে এই বড় মোটা-মোটা হাতরুটি আর টুকটুকে লাল, ঝাল মাংস। এত ঝাল যে জল খেলেও ঝাল যায় না, মুখে দুটো ছোট্ট বাতাসা না ফেললে সে জ্বলুনি থামে না। কিন্তু কি ভালোই যে লাগে! ও তো ভিক্ষে করে আনা টাকা দিয়ে ঐ রুটি মাংস কিনে খাওয়ায়, কানুর আট দশ আনা রোজ দিয়ে আর ওসব খেতে হত না!

তবে কানুরো টাকা পেতে ইচ্ছে করে। আর কিচ্ছু চায় না কানু, শুধু টাকা চায়। অনেক টাকা পেলে, আর ঐ

লাল বাড়ির ছেলেটার সঙ্গে কানুর কোনো তফাৎ থাকবে না। কানুও চকচকে জামা আর নীল ইজের পরে মটর গাড়ি চেপে বেড়াবে।...তবে কানুর সঙ্গে বাবা মা ছোট্ট বোন থাকবে না। কোথায় পাবে ওসব কানু? ও তো আর টাকা দিয়ে বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে না। হঠাৎ কানুর বাবা মা ছোট বোন পেতে ইচ্ছে করে।

পুঁটিরাম বলে ওসব জঞ্জাল না থাকাই ভালো। ওর নাকি আছেও, একটা না, দু' দুটো বোন আর দুটো ভাই, তাদের জ্বালাতেই নাকি বেহার শরিফ্ বলে কি একটা জায়গা থেকে পালিয়ে এসেছে পুঁটিরাম। গবারো বাবা মা আছে, তাদের সঙ্গে ওর দিনরাত ঝগড়া হয়, তাদের নাম করলেই কি সব খারাপ কথা বলতে থাকে গবা।

কানুর ছোটবেলায় এক বুড়ি পিসি ছিল, মাসে মাসে কোত্থেকে তার কয়েকটা টাকা আসত, তাই দিয়ে চলত ওদের, কানুকে একটা পাঠশালে ভর্তি করে দিয়েছিল পিসি। সে পাঠশালের কথা কানু জন্মে ভুলবে না। বিতিয়ে লাল করে ছেড়ে দিত পণ্ডিত মশাই; পুঁটিরামের চেয়েও খারাপ কথা বলত; রোজ রোজ খালি হুকুম করত এটা এনে দে, ওটা এনে দে; কিন্তু কানুকে সে লিখতে পড়তে শিখিয়ে দিয়েছিল। খুব ভালো হিসেব কষতে পারে কানু। মাঝে মাঝে শম্ভুর হিসেবের খাতা লিখে দেয়। কি ক্ষুদি ক্ষুদি কোরে সব খুঁটি-নাটি যে লেখে শম্ভুদা! শম্ভুর ওসব আসে না, কানুকে বলে, তুই-ই বরং হিসেবটা রাখ। একটুও রাগ করে না শম্ভু।

চেয়ে দেখে কানু, হাতে তখনো সেই শুকনো ঝুরঝুরে পাতাটা রয়েছে। দেবে নাকি পুঁতে কোথাও?

গবারা হয়তো এখনো চা'ওলার কাছে কানুর জন্যে বসে রয়েছে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। শুধু সেই ন্যাংলা কুকুরটা জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছে, কাল বিকেল থেকে আসেনি। এক দিক দিয়ে ভালোই হলো, পাতা পুঁতছে দেখে ওরা হয়তো হাসাহাসি করত। পাতার পেছনের কালো দাগ থেকে গাছ হয় এ কথা—কখনোই বিশ্বাস করত না।

বই টইতো পড়ে না ওরা, এসব জানবে কোত্থেকে। ছাপা লেখা ওরা পড়তে পারে, কিন্তু তবুও বই পড়ে না। লিখতেও পারে, পুটিরাম ইংরিজিতে নিজের নাম সই করতে পারে, এমনি চালাক। কিন্তু কাউকে বই পড়তে দেখলে তাকে নুড়ো-পণ্ডিত বলে হাসি-ঠাট্টা করে। বই পড়াকে ওরা ভারি ঘেন্না করে। এমন কি গবা বলে,

"দুটো বই পড়লে কি ট্যাঁকে পয়সা আসবে নাকি রে কেনো? তার চেয়ে বরং বই দুটোকে সের দরে বেচলে কাজে দেবে।"

ঐ করে গবা। এবাড়ি ওবাড়ি থেকে সের দরে পুরোনো কাগজ কেনে, আস্তাকুঁড় ঘেঁটে ঘেঁটেও কাগজ জড়ো করে। লালবাড়ির পেছনের গলিতে মিশিরের গুদোমে জমা দেয়, কাগজ কেনবার পয়সাও মিশির দেয়, তার ওপর সেরপিছু কত করে যেন দেয় গবাকে।

ঐতেই গবার বেশ চলে যায়। রবিবারে তিনকড়ির দল আছে; তাদের সঙ্গে ভিক্ষে করেও কিছু পায়। একবার আস্তাকুঁড় থেকে একটা ঢেঁড়া খাম পেয়েছিল, তার মধ্যে একটা আস্ত দশ টাকার নোট ছিল। কেউ ভুল করে ফেলে দিয়েছিল।

খামের উপরে ইংরেজিতে নাম ঠিকানাও লেখা ছিল, শম্ভু তাই দেখে জিগ্‌গেস করেছিল,

"দিয়ে আসবি নাকি ঐ ঠিকানায়?"

শুনে কানুরা সবাই খুব হেসেছিল। মুড়িওলার পর্যন্ত মজা লেগেছিল। পুঁটিরাম তো রেগেই গেল। ওসব ভালোমানুষি দেখলে ওর গা জ্বালা করে।

পুঁটিরামরা পকেট মারে। কে এক সর্দার আছে ওদের, তার নাম বলা বারণ, তার কাছে কত রকম কায়দা শিখেছে পুঁটিরাম। মাঝে মাঝে ওদের সে-সব দেখায় মজা করবার জন্যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। একবার শম্ভুর ফতুয়ার পকেট থেকে তার মণিব্যাগটা সরিয়ে ছিল। মণিব্যাগ খুঁজে না পেয়ে শম্ভু প্রায় কেঁদে ফেলে। তখন পুঁটিরাম বললে,

"এই নাও শম্ভুদা, তোমাকে দিলাম।"

বলে মণিব্যাগটা গবার পকেট থেকে বের করে দিল। গবা সুদ্ধ হাঁ!

শম্ভু কিন্তু বেজায় চটে গিয়ে, পুঁটিরামকে চোর টোর বলে একাকার। গবা বললে,

"ওরে পুঁটিরাম, ওর পা ধরে ক্ষমা চা।"

পুঁটিরামও হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে শম্ভুর পা ধরতে গেল। শম্ভু পা সরিয়ে নিয়ে, দোকান থেকে নেমে চলে গেল। কি রাগ শম্ভুর।

দোকান রইল খোলা পড়ে। কানু আর পুঁটিরাম আর গবা আগলাতে লাগল, যা চোর ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব এ সব পাড়ায়, সারাক্ষণ চোখ না রাখলেই হয়েছিল! শেষটা রাগ পড়ে গেলে, শম্ভু নিজেই ফিরে এল কতকগুলো শাঁকালু টাঁকালু নিয়ে। পুঁটিরামকে বললে,

"ধর হতভাগা। রাগের মাথায় কখন কি বলি কিছু মনে করিস নে যেন।" শাঁকালু খেয়েই পুঁটিরাম চলে গেছল, দু' তিন দিন ওদিকে

আসে নি। শেষটা কানুই তাকে খুঁজে বের করে ধরে এনেছিল। বোধ হয় মনে লেগেছিল।

শুকনো পাতাটাকে তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলতে হয়। গোল জায়গাটার এক ধারে হাত দিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ল কানু। দেখাদেখি কুকুরটাও মাটি আঁচড়াতে লাগল। গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে পাতাটাকে বসাতে যাবে, এমন সময় কে বললে,

"ওখানে তো ও গাছ হবে না। ওর যে রোদ্দুর সইবে না।"

চমকে কানু ফিরে দেখে রোগা একটা বুড়ো লোক, কেমন চেনা চেনা লাগে। বিরক্ত হয়ে কানু বলে,

"সে তুমি জানলে কি করে, বুড়ো বাবা?"

বুড়ো বললে,

"আমি জানব না? আমার বাড়ি যে পাহাড় দেশে। এই গাছ সেখানে হয়, পাথরের গায়ে, ছায়া ছায়া জায়গাতে।"

পাতাটা হাতে নিয়ে শুঁকে দেখে বুড়ো, বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বলে,

"আঃ, পরাণটা জুড়ুল রে, কতদিন এ গন্ধ শুঁকি নি, এ আমার দেশের গন্ধ।"

পাতাটা ফিরিয়ে দিতে যায় বুড়ো, কানু চেয়ে দেখে ওর হাত কাঁপছে। কানু বলে, "নেবে ওটাকে? আমার কোনো দরকার নেই।" বুড়ো আস্তে আস্তে ঢেঁড়া জামার পকেটে রেখে দেয় পাতাটাকে। দু একবার নাক টেনে, গলা ঝেড়ে বলে,

"আমার কোবরেজি গাছ-গাছড়ার দোকান দেখবে না?"

এতক্ষণে কানু ওকে চিনতে পারে, গলির ওমাথায় গাছ পাতা নিয়ে বসে থাকতে দেখেছে ওকে, তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু এখন তো যাবার উপায় নেই, আপিশের বাবরা এইবার পথে বেরুবে, এই তো জুতো পালিশের সময়।

লোকটা ছাড়তে চায় না,

"তা হলে বিকেলে যাবে, বল।"

কানু বলে,

"বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় যে আমার আরেকবার খোদ্দেরের ভিড় হয়। দুপুরে গেলে হয় না?"

লোকটা বললে,

"তা হবে না কেন? তবে বিকেলে গেলে পুদিনা পাতার চা খাওয়াব মনে করেছিলাম। আমাদের গাঁয়ে ঐ রকম সব খায়, তোমার পাতাটা দেখে মনে পড়ে গেল। ও খেলে সর্দি কাশি সেরে যায়।"

কানু হেসে বলে,

"তা দুপুরেই না হয় পুদিনা পাতার চা খাইও।"

বুড়ো ব্যস্ত হয়ে ওঠে,

"দুপুরে কি করে খাওয়াব? দুপুরে তো আমি আর কোবরেজি করি না।"

"দুপুরে কোবরেজি কর না তো কি কর?"

"কেন, দুপুরে আমার ঘড়ি মেরামতের দোকান দেখি।"

"আবার দু-দুটো দোকান নাকি তোমার?"

বুড়ো হেসে বলে,

"না, না, কোবরেজি দোকানটাই দুপুরে ঘড়ি মেরামতের দোকান হয়ে যায়। আবার সন্ধ্যের আগে কোবরেজি দোকান হয়। যেয়ো, গিয়ে দেখো একবারটি, না হয় একটু রাত করেই যেও।"

তাতেই রাজী হয়ে যায় কানু। আর দেরি করা নয়, এই তো হল কানুর কাজের সময়। রোজ দুপুরে বাঁশতলা কেবিন থেকে ভাত খেয়ে শম্ভুর দোকানে গিয়ে বসে কানু। শম্ভু তখন টিপ কলে স্নান

করে, বাঁশতলা কেবিন থেকে খেয়ে আসে। দুপুরে একটু ঘুমোয় শম্ভু, কানু দোকানে বসে বই পড়ে। আজ শম্ভু খেয়ে এলে কানু বুড়োর কথাটা বললে। শম্ভু কিন্তু খুশি হল না!

"ছাখ্, ওসব যা-তা লোকের সঙ্গে বেশি দহরম-মহরম না করাই ভালো! ফুটপাতে মানুষ হলি আর এটাও জানিস নে? কে লোকটা?"

লোকটা যে কে তা কানুও জানে না। বললে, "কি জানি কোন পাহাড়ে নাকি ওর বাড়ি, অনেকদিন এখানে আছে, বাড়ির জন্যে বোধ করি মন কেমন করে।"

পাশ ফিরে শুয়ে শম্ভু বললে,

"হাঁ! মন কেমন না আরো কিছু। তাই তোর সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব করতে এসেচে! আমি এই বলে দিলাম, কেনো, সময় থাকতে সাবধান হ। ওর অন্য কিছু মতলব আছে।"

কানুর হাসি পায়। কি যে বলে শম্ভু, লোকটাকে তো ভালোই মনে হল। তাকে কথাও দিয়েছে। যাক গে, তাই নিয়ে শম্ভুকে রাগিয়ে আর কি হবে? চুপ করে বই পড়তে থাকে কানু।

আজ হঠাৎ সাড়ে চারটে বাজার অনেকক্ষণ আগেই নাড়ুগোপাল তেওয়ারির সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল। অন্য দিন কানুদের কাউকে দেখলেই ও মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে যায়। আজ কিন্তু তা করল না।

সোজা কানুর দিকে চেয়ে রইল। মুখটাকে একটু লাল মতন লাগল, চোখের পাতাটা ভিজে। পিটেছে বোধ করি মাস্টার মশাই পড়া বলতে পারে নি বলে। একটু হেসে কানু বইএর পাতা ওল্টায়।

কিন্তু তা হলে তেওয়ারি জানতে পারল কি করে? কিছু একটা

হয়েছে নিশ্চয় ওদের বাড়িতে। ওর মার অসুখ করে নি তো, কিংবা ছোট বোনটার? যাক গে, কানুর আর কি? ঠিক এই সময় পুঁটিরাম ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,

"কানু, আমাকে লুকিয়ে রাখ শিগ্‌গির।" কানু একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তখুনি দোকানের দরজা এঁটে দিল। দূরে একটা হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছে।

৪

দরজা বন্ধ হলেও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুঁটিরাম। শম্ভু মুখ তুলে বিরক্ত হয়ে বললে,

"পেছনে পুলিশ লেগেছে তো মাস্টারের? সে আমি আগেই জানি। কানু, যা তো চট্ করে দরজার বাইরে থেকে তালা দিয়ে, গাছতলায় জুতো পালিশের বাক্স নিয়ে বস গে যা। তা হলে ভেতরে লোক আছে জানান দেবে না।"

দরজাতেই তালাচাবি ঝোলে, বন্ধ করে জুতো পালিশের বাক্স নিয়ে বসতে এক মিনিটের বেশি সময় লাগে না। পথে লোকজন নেই; ও ফুটপাথ থেকে পানওয়ালা দেখলেও দেখে থাকতে পারে, তবে তার কাছ থেকে কথা বেরুবে না, এও ঠিক।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে রৈ রৈ করতে করতে একদল লোক এসে হাজির। ইদিক উদিক তাকিয়ে দেখে। এদিকেই তো ছুটে এল ছোকরা, তবে গেল কোথায়? কানুকে জিগ্‌গেস করে,

কানু খানিক বোকার মতো চেয়ে থাকে, খুশি মুখ করে বলে,

"জুতোটা সাফ করে দেব বাবু? মাত্র এক আনা।"

"নাঃ, এ আহাম্মুকটার কাছে কোন খবর পাওয়া যাবে না। চল, পানওলাকে পুছি।"

পানওলাতো রীতিমতো খেঁকিয়ে ওঠে, "আমি দিন আনি দিন খাই, বাপু। আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই কে কোথায় পালাল তাই দেখি! কেন, মাইনে পাও না তোমরা?"

শেষ পর্যন্ত বকাবকি করতে করতে চলে গেল তারা! তারপর সত্যি সত্যি দুজন বড় ছেলে এসে জুতো পালিশ করাল, দু আনা রোজগার হল কানুর। তারপর উঠে গিয়ে, যেন কিছুই হয় নি এমনি-ভাবে তালা খুলে দিল।

ভেতরে শম্ভু আর পুঁটিরাম পাশাপাশি শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। কানু হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না। গায়ে একটু বাইরের হাওয়া লাগতেই দুজনে উঠে বসল। শম্ভু বললে, "পুঁটে আজ আর তোর বেরিয়ে কাজ নেই। এইখেনে গা ঢাকা দিয়ে থাক। ভালো বললে তো আর শুনবি নে।"

সত্যি সত্যি দোকানের পেছন দিকের সরু ফালি জায়গাটাতে শুয়ে শুয়ে জিরোয় পুঁটিরাম। আবার বলে নাকি বেজায় খিদে পেয়েছে। এই সময় মুড়িওলাও আসে, চা-ওলা আসে, এখানে ওদের নিত্য খদ্দের বাঁধা আছে, পার্কে গিয়ে বসবার আগে, রোজ একবার ঘুরে যায়।

এই সময় অন্য দিন ছেলেটা ফেরে। আজ আগে এল কেন কে জানে। সে বিষয় কিছু বলে না কানু, কিছু বললে পুঁটিরাম তাই নিয়ে পাঁচ কথা বলবে, তোর অত মাথা ব্যথা কিসের, হেনা তেনা সাত সতেরো।

সন্ধ্যের পর কানু হিসেব করছিল, দিনে চার আনা করে জমাতে পারলে কতোদিনে এক হাজার টাকা হতে পারে, আর ভাবছিল

শম্ভুকেও ঐ বুড়ো লোকটার মতো একঘরে দু-রকম দোকান খুলতে বলে দেখবে কি-না।

শম্ভু মাঝে মাঝে কোথায় যেন যায় কার সঙ্গে দেখা করতে, কার খবর নিতে। এক একদিন গম্ভীর হয়ে ফেরে, এক একদিন আবার খুসিতে ঝলমল করে।—সেদিন সঙ্গে করে কিছু-না-কিছু আনেই কানুর জন্যে।

আজ এখনো শম্ভু আসেনি, একেবারে সকাল সকাল খেয়ে দেয়েই ফিরবে বোধ হয়।

কানুর হঠাৎ খেয়াল হোল বড়োবাড়িতে কিছুক্ষণ থেকেই যেন লোকজনের আনাগোনা চলেছে, গাড়িও দাঁড়িয়েছে বেশ কয়েকটা। তেওয়ারি সাধারণতঃ গেটের কাছে বসে থাকে, আজ সেও বার বার বাইরে যাচ্ছে আসছে।

হিসেব কষতে কষতে কানুর খেয়াল হোল, এক হাজার টাকা জমতে জমতে শম্ভুর বাড়িটা টিকে থাকলে হয়, আর টিকেই যদি না থাকলো, তবে সারাবে কাকে? এক হাজার টাকায় কি আর নতুন বাড়ি হয়?

ইতিমধ্যে বড়ো বাড়ীর গেটের কাছে অনেক লোকের ভিড়, আর বেশ কথাবার্তার আওয়াজ টের পাওয়া যাচ্ছে। না, একবার উঠে না দেখলেই নয়। দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতে যাবে, হন্তদন্ত হয়ে শম্ভু ঘরে উঠল, তারপর কানুকে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে আনতে আনতে বললো,

—"আয়, ভেতরে এসে বস্, ও-সব দেখতে নেই।"

কথাটা কেমন যেন খাপছাড়া শোনাল কানুর কাছে। কিইবা দেখতে পেয়েছে কানু, যা দেখতে নেই! এক লহমার মধ্যে শুধু চোখে পড়েছে বড়ো বাড়ির গেটের ভেতরে বাইরে ব্যস্ত সমস্ত কয়েকজন লোক!

শম্ভুই আবার কথা বললে—"বড়োবাড়ির কর্তার মা'টি মারা গেলেন,—ছিয়াশী বছর বয়েস হয়েছিল বুড়ীর। শুয়েই তো থাকত ইদানীং, উঠে বসতেও পারত না, চোখে দেখত না, কানে শুনত না, কথাবার্তাও বলতে পারত না।"

তার মানে নাড়ুগোপালের ঠাকুমা। বাব্বা ছিয়াশী বছর কেউ বাঁচে? কানু হঠাৎ জিগ্‌গেস করে বসে,

"তোমার বয়েস ক'বছর হোল গো?"

শম্ভু একটু হেসে বলে,

"পঞ্চাশ তো হোল বলে রে!"

কানু এক হাজার টাকা জমানোর হিসেবের কথা মনে করে এবার ভাবে, নাঃ, তদ্দিনে বেচারা শম্ভুর বয়েসটা বড়ই বেড়ে যাবে!

কোথা থেকে গবা-রা হঠাৎ এসে হাজির। কোথায় ছিল এতক্ষণ কে জানে, একেবারে দল বেঁধে জুটেছে সবাই এক সঙ্গে।

"এই, কেনো, তাড়াতাড়ি চলে আয়।"

"কোথায়?"

"ওরা খই ছড়াবে, চকচকে পয়সা ছড়াবে। আমরা কুড়তে কুড়তে যাবো। চ'না দেখবি মজা!"

কানু চুপ কোরে থাকে। পুঁটে বলে,

"আয়না রে কেনো, ফোকটে কতো পয়সা পাবি, আয় না, অনেক পয়সা হয় রে। ছিপিটোলায় থাকতে একবার এই রকম সঙ্গে গিয়েছিলুম। আমি বাবা ধাঁচ ধোঁচ সব জানি। যে লোকটার কাছে খই-এর ধামা থাকে, তার পাশে পাশেই পয়সা-র থলি নিয়ে একজন থাকে, তারা আগে আগে চলে—ঠিক কেত্তনের দলের পেছনেই। তক্কে তক্কে থাকতে হয় বাবা. খুব নজর খোলা রাখতে হয়!"

কানু কোনো জবাব দেয় না, ভাবে নাড়ুগোপাল এখন কি করছে ?

গবা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে,

"ওরে, ওরা এইবার বেরোচ্ছে রে, দেরি করিসনি। কেত্তনের দল-টল সব রেডি ; বেরিয়ে পড়ি আয়।"

আরো ক'বার ওরা ডাকাডাকি করলে কানুর মনে নেই, তারপর কখন ওরা চলে গেল তাও মনে নেই, খোল আর খঞ্জনীর শব্দে চমক ভেঙে যখন তাকাল, দেখলে বড়োবাড়ির গেট থেকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। আগে পিছে অনেক লোক, মাঝখানে নাড়ু-গোপালের ঠাকুমাকে দেখাই যাচ্ছে না। একেবারে পেছনে খান দুই গাড়িও চলেছে আস্তে আস্তে।

হঠাৎ চোখ পড়ে দোতলার ঝোলানো বারান্দার দিকে। সেখানে ছেলেটা দাঁড়িয়ে, চোখ দুটো ফুলো-ফুলো লাল-লাল। লাল কেন ? বুড়ীটা গেছে তো ভালোই গেছে। তবে কি বুড়ীকে ও ভালো বাসত ! যাঃ ! ও রকম থুত্থুরে বুড়ীকে আবার ভালোবাসা যায় নাকি ? আজ বিকেলে কাপড়-চোপড়ও ছাড়েনি, ইস্কুলের জামা ইজের পরেই আছে। পাশে বোনটি অবাক হয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে। আর মা, চুল বাঁধেন নি, তাঁর চোখও লাল। পথের দিকে একদৃষ্টে সব তাকিয়ে, আর কোনো দিকে চোখ নেই !

শেষ গাড়িটা দোকান ছেড়ে চলে গেলে, আরেকবার কানু উপরে তাকাল, ছেলেটাও ওর দিকে চেয়ে রইল, চোখ ফেরাল না, তাকিয়েই রইল। কিন্তু কানুকে দেখতে পেল কি ? মনে হল যেন কিছু দেখতে পেল না !

বৃষ্টির জলে ভিজে রাস্তাটা কালো কুচ্‌কুচে দেখাচ্ছে, মাঝে মাঝে জমে থাকা জলের ওপর আলো ঠিকরে পড়ছে। বড়োবাড়ির সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল, কালো রাস্তার ওপর সাদা সাদা খই ছড়িয়ে পড়ে রইল এখানে ওখানে। খোল আর খঞ্জনীর শব্দ তখনো মিলিয়ে যায়নি, ওরা রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে যায়নি তখনো। কানু মুখ তুলে আর একবার তাকাল! অন্ধকারে দূরে সবসুদ্ধ যেন একটা জমাট কিছু চলে যাচ্ছে বলে মনে হোল, আগে পিছের লোক, কেত্তনের দল, খই-এর ঠোঙা হাতে লোক,—সব একাকার হোয়ে গেছে; তবু তারি মধ্যে, সেই জমাট বাঁধা ভিড়ের থেকে আলাদা আলাদা দেখা যাচ্ছে কয়েক জনকে, কালো কালো ভূতের মত রোগা রোগা হাত পা নাড়তে নাড়তে চলেছে, মাঝে মাঝে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছে, আবার হঠাৎ রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। অন্ধকারে কালো কালো ছায়ার তৈরী চারপেয়ে জানোয়ারের মতো কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, তারপর আবার লম্বা লম্বা পা ফেলে সেই জমাট ভিড়ের মধ্যে মিশে একাকার হোয়ে যাচ্ছে। এমনি করতে করতে কতদূর কত রাত্তির অবধি ওরা যাবে কে-জানে!

রাস্তাগুলো রাত্তির বেলায় ভিজে থাকলে বোধ হয় একটু বেশী ফাঁকা দেখায়। কতোই বা রাত হয়েছে, এরই মধ্যে কেমন যেন শুন্‌শান্ ভাব। বড়োবাড়িতে আজ রেডিওটাও বাজছে না, এদিকে শম্ভু এমন ভাবে শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছেই হয়তো।

কানুর হঠাৎ কেমন একলা লাগে। শম্ভুর সঙ্গে একটু কথা বলতে পেলে বেশ হোত। শম্ভু বড়োবাড়ির ঠাকুমার এতো কথা জানে, আর ঐ ছেলেটা কেঁদেছে কি-না জানে না?

বিকেল থেকে ন্যাংলা কুকুরটা এ-মুখো হয়নি, এখন কোথা থেকে এসে রাস্তার ধারে ধারে ছড়িয়ে-পড়া খইগুলোকে শুঁকে শুঁকে দেখতে লাগল।

কুকুরটা দোকানে উঠলে শম্ভু রাগ করে, কিন্তু কানু না ডেকে পারলে না,

"আয়, আয় ভুলো, এখানে আয়, আয়।"

লেজ নাড়তে নাড়তে ভুলো কানুর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল, মুখ তুলে চাইল ওর দিকে।

"কোথায় ছিলিরে এতক্ষণ, এ্যাঁ?"

কানু বসে বসে ভুলোর পিঠে হাত বোলাতে থাকে।

"ক্ষিধে পেয়েছে বুঝি তোর?"

তারপর খানিকক্ষণ ওকে আদর টাদর করে আবার বলে—

"কোথায় থাকিস্ বলতো আজকাল? রোগা হয়ে গেছিস, লোমগুলো নোঙ্‌রা নোঙ্‌রা!"

ভুলোর গলাটা জড়িয়ে কানু ওর কানের কাছে গাল ঘষতে থাকে।

শম্ভু চোখ বুজিয়েই বলে ওঠে,

"আজ আদরের বহরটা একটু বেশি বেশি মনে হচ্ছে যেন!"

কানু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে।

"ভুলোকে আজ আমি নেমন্তন্ন খাওয়াবো। যাচ্ছি শম্ভুদা, আমিও একেবারে খেয়ে দেয়ে ফিরবো কিন্তু।"

শম্ভু পাশ ফিরে শুতে শুতে বলে,

"আচ্ছা।"

ভুলোটা খুব খেয়েছে আজ, তাই দোকানের দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লেজ নাড়তে লাগল, ভাবটা যেন, এইবার কিন্তু

রেহাই দিতে হবে, এখন ঘুমোতে চাই। ও জানে দোকানের মধ্যে শুয়ে থাকা শম্ভু পছন্দ করে না।

পা-মোছা চটটা তুলে নিয়ে দরজার বাইরে সিঁড়ির শেষ ধাপে পেতে দিলে কানু, বললে, "নে শুয়ে পড়।"

তারপর নিজের মাদুরটা পাততে পাততে টের পেলে শম্ভুর নাক-ডাকা শুরু হোয়ে গেছে। দরজাটা ভেজিয়ে রাখা দরকার, কিন্তু বাইরের ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়াটা কানুর ভালো লাগছিল। ভেজিয়েই দিতে হোল, শম্ভু যদি আবার রাগ করে!

পরদিন সকালে উঠে দোকানের দরজা খুলেই কানু দেখলে ভুলো নো পাত্তা! কখন খেয়াল হবে কে জানে, তখন ফিরে আসবে আবার। চটটাকে টেনে দোকানের দরজায় বিছিয়ে দিয়ে কানু ফুটপাথের ধারে গিয়ে বসে চা-ওলার কাছে। ওকে দেখেই গবারা হৈ-হৈ করে ওঠে—

"এই যে চাঁদ, ঘুম ভাঙ্‌ল!"

সকাল বেলাতেই টিটকিরির কথা কানুর ভালো লাগে না, কোনো জবাব দেয় না।

মেজাজটা বিচ্ছিরি লাগে, দাঁতের গোড়া ব্যথা করে, পেট কামড়ায়। তাই তো, এসব তো ভালো লক্ষণ নয়। তা হলে তো ওষুধ খাওয়ার দরকার। তার মানে ঐ বুড়োর কাছে যেতে হয়। তাছাড়া সে অত করে বলেছে যখন, তার কাছে যাওয়াটাই তো উচিত। গবারা যে যার পথ দেখে, এখন কারো হাতে সময় থাকে না।

ব্যস্, মনটা হাল্কা হয়ে গেল। আজ সন্ধ্যে লাগতেই বুড়োর কাছে যাওয়া। কিন্তু শম্ভুকে কিছু বলা নয়। এক এক বিষয় শম্ভু যেন কি রকম করে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে থাকে। তা হলেই মুস্কিল, পথঘাট নোংরা থাকলে কেউ জুতো পালিশ করায় না। কে আবার জলে দাঁড়াবে? আর পালিশ করালেও পাঁচ মিনিটে আবার যে-কে সেই। যাক গে, কানু আজ ছুটি নেবে। এবেলাই যাবে বুড়োর কাছে। ফুর্তির চোটে চায়ের সঙ্গে দুটো দুটো বাঁদুরে বিস্কুট খেয়ে ফেলে কানু।

শম্ভু উঠে মুখ হাত ধুতে যায়। কানু দোকানে ঝাঁটপাট দিয়ে বসে বসে ভাবে, রোজ রোজ কেন এক রকমের হবে? পাখিদের রোজ কি এক রকম হয়? কানু পাখি হতে চায়। যেখানে খুশি যায় ওরা, পয়সা লাগে না।

বৃষ্টি থামে, মেঘ ছিঁড়ে যায়, ফিকে একটু রোদ ওঠে, জল মেখে লতাগাছ ঝকমক করে, মাকড়সার জাল ঝলমল করে, একটা হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। কানুর হলদে প্রজাপতি হতে ইচ্ছে করে।

লালবাড়ির আলসের ওপর দুটো ছাই রঙের পায়রা বুক ফুলিয়ে বলে বকম-বকম। মুখ তুলে ঠোঁট দিয়ে ঘাড়ের পালক গুছোয়, গলায় সকালের রোদ পড়ে সাত রকমের রঙ খেলে। কানুর আজ পায়রা হতে ইচ্ছে করে।

শম্ভুর বেঞ্চির তলা থেকে মরচে ধরা একটা পুরোনো বিস্কুটের টিন টেনে বের করে কানু, তার মধ্যে থেকে বঁড়শি বের করে, ঘরের কোণা থেকে পুরোনো ফাটা ইকড়ার একটা ছিপ বের করে, পুকুর পাড়ে অঢেল কেঁচো। এমনি সময় শম্ভু ফিরে এসে বলে,

"তা বাবুর আজ ছুটি নাকি?"

কানুর বেশী কথা বলতে ইচ্ছেও করে না, সময়ও নেই। বলে,

"হুঁ।"

"তা দু চারটে বড় মাছ আমাদের কপালেও জুটবে নাকি ?"

কানু বলে,

"জুটবে।"

বলেই এক দৌড়ে বেরিয়ে পড়ে। পুকুর ধারে গিয়ে দেখে ইস্পাতের মতো জলের রং, তার ওপর লম্বা লম্বা ঠ্যাংওয়ালা কি যেন বড় বড় মাকড়সার মতো পোকারা চিড়িক চিড়িক করে ছুটে বেড়াচ্ছে। মাছ ধরতে ইচ্ছে করে না।

কানু বুড়োর দোকানে গিয়ে হাজির হয়। বুড়ো তো ওকে দেখে মহা খুশি!—"এই যে, তা হোলে সত্যি করে আসা হোল! কি খাবে বল ?"

কানু ছিপটাকে নামিয়ে বুড়োর দোকানটাকে তাকিয়ে দেখে। ঘরের এপার ওপার দড়ি বাঁধা, দড়ি থেকে কত রকম শুকনো গাছ গাছালির গোছা ঝোলানো। পেছনের দেয়ালে সরু সরু তাক, একটার ওপর একটা একেবারে ছাদ অবধি উঠে গেছে, ঘরের কোণায় সরু একটা বাঁশের মই।

নিচের তাকগুলোর দরজা বন্ধ, তালা দেওয়া। ওপরের তাকের দরজা খোলা, তাতে ছোট বড় হাজার রকমের শিশি, বোতল, কৌটো।

বুড়ো ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কি দিয়ে যে কানুর যত্ন করবে ভেবে পায় না!

"আচ্ছা, একটু ছুরপি খাবে ?"

"ছুরপি আবার কি জিনিস ?"

"ওমা, ইয়াক্ গোরুর দুধের ক্ষীর শুকিয়ে আমাদেব দেশে ছুরপি হয়, তাও জানো না ?"

বলে, শুকনো নারকোলের কুচির মতো কি যেন দেখায়।

কানু বলে—"না, না, ও আমি খাইনে।"

"তবে কি লেড়ুয়া বিস্কুট দিয়ে ডাপ্পি খাবে?"

"ডাপ্পি তো পচা মাছ, ও আবার খায় নাকি?"

বুড়ো চটে গেল।

"কে বলেছে ডাপ্পি পচা মাছ? ডাপ্পি এক রকম মশলার আচার বলতে পারো, তবে ওতে মাছও দিতে হয়। পচা হবে কেন? হাজার হাজার লোকে আনন্দ করে খায়, বললেই হোল পচা!"

বলে, ছোট্ট একটা মেটে রঙের বোয়েম খুলে কালচে কালচে কি যেন দেখাল, কি গন্ধ রে বাবা!

কানু ব্যস্ত হোয়ে উঠে বললে,

"ওসব আজ দিও না আমাকে, আমার দাঁতের গোড়া কন্‌কন্ করছে, পেট কামড়াচ্ছে।"

চশমার ওপর দিয়ে বুড়ো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

"তাই কচ্ছে, নাকি মেজাজ খারাপ লাগছে?"

কানু রেগে যায়,—"ও কি কথা! মেজাজ খারাপ লাগবে কেন?"

"না, মানে, মেজাজ খারাপের আমার কাছে খুব ভালো ওষুধ আছে কি না, তাই বলছিলাম।"

বলে, এক গোছা শুকনো ঘাসের মতো কিসের দিকে তাকায়।

কানু তাতে নাক লাগিয়ে শোঁকে, কি যে মিষ্টি গন্ধ তার!

"এইটে খেলে মেজাজ খারাপ ভালো হয় নাকি?"

বুড়োর হাসি পায়,

"আরে না, না. ও তো অন্ধ লোকের চোখে দেখবার ওষুধ।"

"দ্যুৎ! তাই আবার হয় নাকি?"

"বিশ্বাস না হয় খানিকটা নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারো। তবে মনে রেখো, যাদের মনে হিংসে থাকে, ও ওষুধ তাদের জন্য নয়।"

৬

একটা শিশিতে কতকগুলো সাদা বড়ি দেখিয়ে কানু বলে,—"এগুলো কি?"

"ওগুলো ঘুম পাড়ানি ওষুধ, রাতে যাদের ঘুম হয় না তাদের জন্যে। আর এইটে দুঃস্বপ্নের ওষুধ। তুমি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখ না আশা করি?"

কানু জোরে জোরো মাথা নাড়ে—না, না, সে ভালো স্বপ্ন দেখে। মানে ওগুলোকে ঠিক দুঃস্বপ্ন বলা যায় না।

বুড়ো আরেকবার ওর দিকে তাকিয়ে বলে, "আচ্ছা, তোমাকে মেজাজ খারাপ সেরে যাবার ভালো ওষুধ দিচ্ছি, মিছ্‌রির গুঁড়ো দিয়ে খেতে হবে। এই নাও এই মিছ্‌রির দলাটি ধর, এই দিয়ে খেও।—আহা-হা, অমন করে নিতে হয় নাকি? দাঁড়াও কাগজে মুড়ে দিই।—কিন্তু মেজাজটা খারাপই বা হয় কেন?"

কানু পা গুটিয়ে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে বলে,

"আমার গরিব হোতে ভালো লাগে না।"

"ও—ও! বড়লোকিতে পেয়েছে বুঝি? তা, এই ওষুধটা একবার খেয়ে দেখতে পারো?"

বলে ছোট্ট একটা শিশিতে করে কালো দানা-দানা মতন কিসের বীচি না কি যেন দিল কানুর হাতে।

"এই খেলেই আমি বড়লোক হয়ে যাব বলতে চাও?"

"বড়লোক হবে, তা তো বলিনি। মেজাজ খারাপ সেরে যাবে।"

"বড়লোক না হোলে আমার মেজাজ খারাপ সারবে না কখনো।"

"বেশ, তা হোলে, বড়লোকই হবে হয় তো। মোট কথা মেজাজ খারাপ সেরে যাবে। আচ্ছা এখন আমার সঙ্গে খেয়ে যাবে তো? আমি নিজে রান্না করি, তা জানো?"

বলে ঘরের কোণা থেকে একটা ছোট লণ্ঠনের মতো কি বের করে, তাতে বোতল থেকে তেল ঢেলে, জ্বালাল। অমনি সাপের মতো গর্জে উঠল সেটা।

"এটাকে স্টোভ্ বলে শিখে রাখো। এবার এতে কেমন রান্না হয় দেখ।"

বুড়ো ঐ মজার স্টোভটাতে বড়ো একটা হাঁড়ি চাপাল। তাতে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, হাঁসের ডিম, শাকের পাতা—সব এক সঙ্গে সেদ্ধ করে নিল। তারপর দুটো কানা-তোলা থালায় ঢেলে নিয়ে দুজনায় খেতে বসল।

সেই ছোট মেটে বোয়েমটা থেকে একটুখানি ঘাপ্পি নিয়ে নিজের ভাতের সঙ্গে মেখে, কানুকে বললে,

"না শুনে যে বিচার করে তাকে বোকা বলে। দেখবে নাকি একটু চেখে?"

কানুও একটু মেখে নিয়ে খেয়ে দেখে যেন অমৃত।

খাওয়ার পর বুড়ো কানুকে ভাজা মশলা খাওয়াল।

বাড়ি যেতে যেতে কানুর সন্ধ্যে হয়ে এল। ঘরে এসে উঠতেই শম্ভু বললে,

"সারাদিন মচ্ছোব করে হাঁড়ি মুখে ফেরা হচ্ছে কেন?"

কানুর একটু বিরক্ত লাগল। শম্ভুদা একেক সময় যেন কি রকম

করে। দোকানে উঠে বসে পা ছড়িয়ে অনেকক্ষণ পথের দিকে চেয়ে রইল।

বড়লোক হতে হবে। বড় একটা মটর কিনে, চকচকে জামা আর নীল ইজের পরে সেটা চালাতে হবে, হাতে থাকবে এই বড় একটা সোনার হাত ঘড়ি। মস্ত বড় বাড়িতে থাকবে কানু, দশটা চাকর রাখবে, নিজের জুতোও পালিশ করবে না। রাস্তার লোকদের সঙ্গে আর মিশবে না কানু; কানুর বাড়িতে খাবার ঘরে পিঁড়েয় বসে এই বড় বোগি থালায় ভাত খাবে কানু। টিকিওয়ালা বামুনঠাকুর হাতা নিয়ে এসে জিগ্‌গেস করবে, 'বাবু, আরো দেব?' পুঁটিরাম, গবাদের সঙ্গে কথা বলবে না কানু। গবা আস্তাকুঁড় ঘেঁটে ময়লা কাগজ জড়ো করে, আর পুঁটিরাম? পুঁটিরাম তো একটা সাধারণ চোর, ওসব লোকের সঙ্গে বড়লোকেরা মেশে কখনো?

অমনি চোখের সামনে ভেসে ওঠে গত বছর সাত দিনের বৃষ্টিতে পথঘাট ভেসে গেছিল, কানুর খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ, পাছে শম্ভুর ভাগ থেকে খেতে হয় বলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই সময় একদিন অনেক রাতে ওকে খুঁজে খুঁজে বের করে পুঁটিরাম একটা মাটির হাঁড়িতে করে মোটা মোটা হাতরুটি আর মাংস খাইয়েছিল। কতদিন গবার পয়সায় সিনেমা দেখেছে কানু, সব বড়লোকদের বিষয় ছবি।

আবার মেজাজটা খিঁচড়ে ওঠে কানুর। পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজের বাক্স বের করে। তার মধ্যে গোলাপী তুলোর ওপর একটা হলুদ রঙের বড়ি। কোবরেজের গুলির মতন দেখতে। বড় লোক হবার বড়ি। ও বড়ি খেলে কানুর গরীব হওয়া ঘুচবে। বুড়ো তার সিন্দুক থেকে বের করে ওকে দিয়েছিল। যা-তা বড়ি নয়।

কানু জিগ্‌গেস করেছিল,

"তবে তুমি নিজে খাও না কেন ওষুধ? তুমি তো পয়সা নেই বলে দেশে ফিরে যেতে পারছ না।"

বুড়ো বললে,

"না রে ভাই, ওষুধ তুই নে। আমি বড় লোক হবার আরো অনেক সন্ধান জানি।"

এই বলে ছেঁড়া মাদুরের ওপর তেলচিটে একটি বালিশ পেতে টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল।

ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছিল, ফুটপাথের গাছটা থেকে হলুদ ফুল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, কানুর কি রকম গোলমাল লাগছিল, বুড়ো কি নিজে বড়লোক হয়ে গেছে নাকি? একবার এ কথাও মনে হয়েছিল, তাহলে দেবে নাকি বড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে!

ভাগ্যিস ফেলে নি। কি হোত ফেললে? হয় তো কাগে খেয়ে নিত। তা হলে কি কাগটা বড়লোক হোয়ে যেত নাকি? কানু কখনো বড় লোক কাগ কি বড় লোক অন্য জানোয়ার দেখে নি। বড় লোকদের কুকুর অনেক দেখেছে, চামড়ার বগ্‌লেস লাগিয়ে, শেকল বেঁধে, চাকরের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে। বড়লোকের কুকুর বলেই তো আর কুকুরটা বড়লোক হোয়ে যায় না। তার চেয়ে বরং নেড়িকুত্তো হোয়ে নিজের খুশি মতন পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ভালো। জানোয়াররা বড়লোক হয় না। আবার গরিবও হয় না।

হাসি পায় কানুর। তা হোলে কি এও ঠিক নয় যে ঐ ছেলেটার মতো চকচকে জামা আর নীল ইজের পরে সারাক্ষণ হয় চাকর নয় বাবার সঙ্গে কয়েদ হোয়ে থাকার চেয়ে কানুর মতো ইচ্ছে মতো পথে পথে ঘোরা ভাল?

শম্ভু ঘরেই বসেছিল, এতক্ষণ পরে কথা বলল।

"আজ এদিকে ভারি ধরপাকড় চলেছিল, দেখতে পেলে না তো কিছু। এবার দেখবে পুঁটিরামদের দল ভাঙ্গবে। পুঁটে হতভাগা ধরা না পড়লে বাঁচা যায়। এদিকে তো দিব্যি চৌকোস ছেলে, কি ইচ্ছে করে জানিস্ কেনো?—ওটাকে নিয়ে গিয়ে আমার পুরোনো বাড়িটা সারাতে লাগিয়ে দিই। এখন কিছু টাকা যোগাড় করতে পারলেই হয়!"

উঠে বসে এক গাল হেসে শম্ভু বলে, "আজ কি করেছি জানিস্, কেনো, ঐযে লাল ক্রুসের লটারি হয় না, একেবারে দড়াম করে তার পাঁচটা টিকিট কিনে ফেলেছি। দেখি কিছু ওঠে কি না।"

কানু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে,

"হ্যাঁ! উঠল আর কি! প্রত্যেক বছর তো একটা করে কেনো। কই, পাও কিছু?"

শম্ভু আবার শুয়ে পড়ে বলে,

"তা হয়তো পাইনে, কিন্তু এ বছর পাঁচগুণ জোর হোল তো, এ বছর পেতে দোষ কি? আমিও কিনেছি আর পুঁটে হতভাগাও কোত্থেকে একটা করকরে নতুন পাঁচ টাকার নোট বের করে পাঁচটা কিনেছে? চুরি করা টাকা নয় তো কি? দেখাই যাক ব্যাটার ভাগ্যে কি ওঠে।"

কানু পথের দিকে চেয়ে থাকে, কিচ্ছু দেখতে পায় না, খালি মনে হয় এক্ষুণি বড়লোক হয়ে যেতে পারি, বড়ি খেলেই টাকা হবে আমার!

শম্ভু বলে,

"বুঝলি কেনো, সে এক কাণ্ড! বড় রাস্তা থেকে বেরিয়েছে

এই গলিটা, চোরদের পালাবার এই তো পথ! বাস সুদ্ধ্ লোক নেমে পড়ে হৈ হৈ করে পকেটমারের পেছন পেছন ছুটে এসে, এইখানে ঠিক আমার দোকানের সামনে তাকে ধরে ফেলল! কি বলব রে, দিব্যি ফর্সা ধুতী পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক, তাকেই ধরে কি মার! নাকি কার মনিব্যাগ নিয়ে পালিয়েছে! কিন্তু হোলে কি হবে, তার পকেট হাতড়ে, জামা কাপড় ঝেড়ে ঝুড়ে কিচ্ছু পাওয়া গেল না, তবু তাকে নিয়ে থানার দিকে গেল। শেষটা ছেড়ে দিতেই হবে। অথচ ঐ পুঁটেকে ছ্যাখ্, দিব্যি হ্যা হ্যা করে বেড়াচ্ছে! ওটাকে এখান থেকে না সরালেই নয়।"

পুঁটের ওপর শম্ভুর মায়া হয়েছে। অন্য দিন হলে কানু চটে যেত, কারণ শম্ভুকে নিয়ে পুঁটে কি কম হাসাহাসি করে নাকি! কিন্তু আজ আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। সরে গিয়ে একটু অন্ধকারে বসে মাথাটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে, চোখ বুঁজে, টপ করে বড়িটাকে গিলে ফেলে। চোখ বুঁজেই মুখে একটু মিছ্রির গুঁড়ো ফেলে দেয়।

তারপর চোখ খুলেই চেয়ে দেখে বকুলতলায়, জুতো পালিশের বাক্সের পেছনে, নালার মধ্যে ওটা একটা মনিব্যাগ না? এক নিমেষে কানু নেমে গিয়ে সেটাকে তুলে নেয়। খুলে দেখে একশো টাকার নোটে ঠাসা মনিব্যাগটা!

এমনি করেই তবে কি বড়লোক হওয়া যায়?

এই কি তবে বড়লোক হওয়া?

৭

মনিব্যাগটাকে বুকে চেপে ধরে কানু, ভাবে অনেকগুলো টাকা থাকলেই কি বড়লোক হওয়া যায়? কিচ্ছু বদলাল না কানু, শুধু একটা কার মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেল, ব্যস্, অমনি কি গরিব কানু বড়লোক হয়ে গেল? ঐ লাল বাড়ির ছেলেটার সঙ্গে আর কোনো তফাৎ থাকল না?

কে দেখে ফেলবে, অমনি ছিনিয়ে নেবে, টাকাগুলো গোনবার উপায় নেই। এই এত টাকা নিয়ে লোকেরা ট্রামে বাসে যাওয়া-আসা করে নাকি? কানুর এতগুলো টাকা থাকলে আগেই একটা বাড়ি কিনে ফেলত, আর কেউ তা হলে পকেট মেরে টাকা চুরি করে পালাত না। যে লোকটার টাকা তার এখন কেমন লাগছে কে জানে?

এ কথা মনে হতেই কানুর আবার পেট কামড়াতে থাকে, মুখের মধ্যে নোন্‌তা লাগে। শম্ভুকে তো কিছু বলা যায় না। হয় তো হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পথের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, অন্য লোকে কুড়িয়ে নিয়ে বড়লোক হয়ে যাবে। যার টাকা সে যে পাবে না এটা তো ঠিক। এ নিশ্চয় তার পকেট থেকে নিয়ে চোরটা এই দিকে পালিয়েছিল, তারপর যখন দেখে এইবার ধরা পড়বে অমনি ছুঁড়ে এমন জায়গায় ফেলেছিল যে কারো চোখে পড়ে নি। কানু যদি বুড়োর ওষুধ না খেত, কানুও নিশ্চয় পেত না।

টাকাগুলো বুকে চেপে ধরে আড়ালে গিয়ে খুব খানিকটা নেচে নিল কানু। উঃ! আর অন্য লোকের নোংরা জুতোয় হাত দেওয়া নয়। এবার শুয়ে শুয়ে আরাম করবে কানু! খুব ভালো ভালো জিনিস খাবে, ভালো একটা চকচকে জামা আর নীল ইজের কিনে ফেলবে, জুতো কিনবে। জুতো কিনলেই লোকে বড়লোক হয়ে যায়। ঐ ছেলেটার সঙ্গে কোনো তফাৎ থাকে না।

থাকে না কি কোনো তফাৎ? মনটা আবার ভারি হয়ে আসে। আবার মন খুঁত খুঁত করে। তাই তো টাকা পেলেই কি বড়লোক হওয়া যায়? টাকা পেয়েছে বলে অমনি বদলে যাবে কি কানু?

হাজার টাকা পেলেই শম্ভুদার বাড়ি সারানো আরম্ভ হয়। কিন্তু কুড়িয়ে পাওয়া টাকা শম্ভুদা নেবে না, কানু সেটা জানে। লটারি জেতা টাকা নেবে, কিন্তু এ টাকা নেবে না। ও আবার কি কথা? কানুর বড়লোক হবার টাকা শম্ভুদাকে দেওয়াই বা কেন? এসব কি ভাবছে কানু? ওর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

মোটা মণিব্যাগটাকে কোনো রকমে পকেটে পোরে কানু, কালো ইজেরটা বাঁধাকপির মতো ফুলে থাকে, বুকের ভেতরটা কি রকম করতে থাকে, টাকা পেয়েও কই কিচ্ছু বদলাচ্ছে না কেন? বাড়ি, গাড়ি, ভালো জামাকাপড় হোলে পর, তবে কি বদলাবে?

বাঁশতলায় খেতে যেতে ইচ্ছে করে না। সেখানকার লোকেরা কানুকে বড় বেশি চেনে। চেয়ে চেয়ে দেখে যদি শেষটা টের পেয়ে যায় এ কানু সে কানু নয়, এর অনেক টাকা! যদি হিংসে করে সবাই মিলে টাকাটা ছিনিয়ে নিয়ে নেয়? ওরা সক্কলেই তো বেজায় গরিব!

আর যদি কিচ্ছু বুঝতে না পারে, তাই বা কানু সইবে কি করে? যদি কানুকে নজর করে দেখেও ভাবে এ সেই গরিব কানু, লোকের জুতো পালিশ করে খায়! বড়লোক কানু যদি সেই গরিব কানুটার চেয়ে এতটুকুও অন্যরকম না হয়, তা হোলেই বা কেমন করে চলে?

কানু খেতে না গিয়ে, সোজা সেই বুড়োর বাড়িতে গিয়ে উঠল। বুড়ো তখন ওষুধের দোকান তুলে ফেলছে। কানু দেখে এবার ঘরের এধার ওধার, শুকনো গাছ-গাছালির গোছা-বাঁধা দড়ি নেই। ওপরের

তাকগুলোর দরজা আঁটা, নিচের তাক খোলা, তাতে সারি সারি ঘড়ি সাজানো। বুড়োর কপালের ওপর অদ্ভুত একটা চশমা তোলা রয়েছে।

কানুকে দেখে বুড়ো মহাব্যস্ত।

"কি হোল কানু? অসুখ বিসুখ করে নি তো?"

কানু কোনো কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়ো দোকানের দরজা টেনে দিয়ে বলে,

"কোনো খারাপ কাজ করে ফেলেছিস্ নাকি?"

কানু মাথা নেড়ে, মণিব্যাগটা বের করে দেয়।

বুড়োর চোখ প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে আসে! ফিসফিস করে বলে, "কোথায় পেলি?"

কানু বলে,—"কুড়িয়ে পেয়েছি।"

সব কথা খুলে বলে কানু। বুড়ো একটু হেসে বলে,

"তবে আর কি? বড়ি খেয়ে, ঐ তো বড়লোক হয়ে গেছিস্। আবার ছুটে এসেছিস কেন?"

কানু হাঁড়িমুখ করে বলে,

"টাকা হোলেই কি সত্যি বড়লোক হয়?"

"তা আর হয় না? এখানে কম সে কম পাঁচ হাজার টাকা আছে, একটা দোকান কিনে ফেলতে পারিস, একটা হোটেল খুলতে পারিস, তারপর বাড়ি গাড়ি হতে কতক্ষণ?"

কানু বললে.

"এক হাজার টাকা হোলে শম্ভুদা ওর পুরনো বাড়িটা সারায়।"

—"তবে ওকেই দে না এর থেকে হাজার টাকা।"

—"ও কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস নেবে না"।

—"জিগ্‌গেস করেছিস নাকি?"

—"না, আমি জানি।"

বুড়ো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "এটা আসলে চোরাই মাল। যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে চাস্ নাকি? তা হোলে বড়লোক হওয়া হবে না কিন্তু। আর তাকে খুঁজে পাবি কোথায়? তবে হ্যাঁ, থানায় জানানো যায়, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়।

কানু রেগে যায়। বলে,

"তুমি নিজেও তো টাকার অভাবে দেশে যেতে পারছো না, তুমি নেবে না কেন?"

বুড়ো বলে, "না, না, ছ্যাখ্ না, এই দুটো দোকান থেকে দেখতে দেখতে কেমন পয়সা করে ফেলি। এতে লাভ কত!"

কানু বলে,

"তার মানে কুড়িয়ে পাওয়া টাকা তুমিও নেবে না।"

কানুর কান্না পায়। বলে,

"তবে আমাকে ঐ ওষুধ দিয়েছিলে কেন?" চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে কানুর, নাকে সর্দি আসে। বুড়ো হেসে বলে, "ঐ ওষুধটা? আরে, ওটা একটা জোলাপের বড়ি রে কানু, ওতে তোর ভালোই হবে।"

কানুর মাথা থেকে যেন একটা বোঝা নেমে যায়। তা হোলে নিজে নিজেই টাকাটা পেয়েছে কানু, ওষুধের মন্ত্রে নয়। আঃ! বাঁচা গেল। এটাকে নিয়ে তো তাহলে যা ইচ্ছে করা যায়। উঃফ্! মাথাটা হাল্কা হোয়ে গেল।

মণিব্যাগটা বুড়োকে দিয়ে কানু বললে, "তোমার সোনার ঘড়ি রাখবার ঐ ছোট্ট লোহার সিন্দুকটাতে রেখে দেবে নাকি? আমার কাছ থেকে কে নিয়ে নেবে, আমার তো একটা ঘরও নেই।"

বুড়ো তাই রেখে দিয়ে বললে,

"ঘর নেই তো কি হয়েছে? ঘর মানেই তো মাসে মাসে বাড়ি-ভাড়া, বাসন-পত্র, তক্তাপোশ, তালাচাবি, দুর্ভাবনা।"

কানুর খিদে পেয়েছে, ও আর কিছু ভাবতে পারে না।

উঠে পড়ে বলে, "রইল তা হোলে তোমার কাছে। আমি গেলাম।"

এক দৌড়ে বাঁশতলা কেবিনে হাজির হয়। শেষের কটি খোদ্দেরো খাওয়া সেরে তখন যাবার মুখে। কানুকে দেখে মালিক বলে, "আয় বোস্ রে কেনো, আজ তুই আমার অতিথি, এখেনে আমার কাছে বোস্, দু-জনে একসঙ্গে খাই।"

কানুর মনটা খুশি হয়ে যায়। মালিক বলে,

"একা থাকার মতো আর দুঃখ নেই রে কেনো, ভাবছি দেশের বাড়িটা ছেলে বৌয়ের হাতে দিয়ে গিন্নীকে নিয়ে আসি। দোকানের ওপরকার ঘরটাতে বেশ চলে যাবে; বুড়োদের একা থাকতে হয় না।"

কানু ভাবে শম্ভুদাও একা হোত, যদি কানু না থাকত।

মাছের মাথা দিয়ে আলু দিয়ে কি সুন্দর ঘণ্ট রেঁধেছে হাজারি, পেট ভরে খেয়ে নেয় কানু। মালিককে ছাঁচি পান কিনে খাওয়ায়, বাড়ি ফিরতে এগারোটা বেজে যায়।

শম্ভু শোয়নি, পথের দিকে চেয়ে বসে আছে।

"কোথায় গেছলি রে কেনো? ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছিলি। মনটা আজ যেন কেমন ধারা হয়ে আছে। পুঁটিরামটাও এখন অবধি এল না। কি জানি, দলের পেছনে নাকি গোয়েন্দা লেগেছে শুনছি, ছেলেটাকে সরাতে পারলে ভালো হোত।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, পা দুটোকে সামনের দিকে মেলে দিয়ে শম্ভু বলে,

"দেশ থেকে চিঠি এসেছে।"

কানু তো অবাক। শম্ভুদার আবার চিঠি লেখবার লোক আছে এ তার জানা ছিল না।

"তোমার আবার চিঠি লেখবার লোক আছে নাকি, শম্ভুদা?"

শম্ভু বিরক্ত হয়ে বললে,

"তা আর নেই? কেন, আমি কি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছিলাম নাকি? দেশভরা আমার আত্মীয়স্বজন আছে, আমার ঐ বাড়িটা দেখে দেখে ওদের চোখ টাটায়। ভাবে যখন আর রাখতে পারব না, অমনি সব জলের দরে কিনে নিয়ে, আমার ভিটেয় বসে, আমাকে দেখিয়ে বড়মানুষি করবে! কিন্তু ও আমি ছাড়ছি নে বলে দিলাম, যেমন করে হোক, হাজার খানেক টাকা যোগাড় করে, বাড়ি সারাব। বাড়িটা ভাড়া দেব, গোয়ালটাতে থাকব। ও গোয়ালটাও মন্দ নয় রে কেনো। একদিক দিয়ে বরং ওটাই বেশি ভালো, অনেকদিন পরে তৈরী কিনা।

বলতে বলতে সোজা হয়ে উঠে বসে শম্ভু, দু-হাত মুঠো করে বলে,

"ও আর না সারালে চলবে না, কানু। আমার ছোট নাতিটার একটা দাঁড়াবার জায়গা চাই তো!"

৮

কানু আকাশ থেকে পড়ে। বলে, "কি শম্ভুদা? নাতি আবার কোত্থেকে পেলে?" তাচ্ছিল্য করে বলে, "হ্যাঃ! নাতি না আরো কিছু! তোমার কোনো জন্মে নাতি ছিল নাকি?"

শম্ভু বলে,

"ও আবার কি কথা? কেন, আমার নাতি থাকতে দোষ কি, সবার তো থাকে!"

"থাকে তো এদ্দিন ছিল কোথায়, শুনি?" শম্ভুর গলাটা ভারি ভারি শোনায়। বলে,

"ছিল ওর মামার বাড়িতে। সে অনেক দুঃখের কথা রে, কানু। ছেলেটা তো মানুষ হয়নি, দিলে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে। ওর মা তো সেই দুঃখেই ম'ল, নইলে মরার বয়স হয়নি তার, রোগও ছিল না তেমন কিছু। শুধু বাড়িটাতে হাত দিতে পারেনি। জাল জোচ্চুরি করে শেষটা ফেরারি হয়ে গেল, শুনি নাকি কোথায় বিদেশে গিয়ে পয়সা-কড়ি করেছে। তা আমারো খোঁজ নেয় না, নিজের ছেলে বৌকেও দেখে না। ছিল পড়ে তারা বৌয়ের বাপের বাড়িতে! মাসে মাসে খরচ পাঠাতাম, আর ভাবনা ছিল না। তা সে বাপটি মরেছে, সেখানে আর ওদের ঠাঁই হবে না।"

খানিকটা চুপ করে থাকে শম্ভু। তারপর আবার বলে,

"ছাখ্, অনেকদিন এড়িয়ে গিয়েছি, এবার দেশে গিয়ে ওদের ভার নিতে হয়। বাড়িটা ভাড়া দিলেই আমাদের চলে যাবে, বুঝলি। কিন্তু না সারালে তো কিচ্ছু করবার উপায় দেখিনে।"

পাঁচ মণ একটা পাথর যেন কানুর বুকে চেপে বসে। শম্ভুদা যেন আর সেই চেনা শম্ভুদা থাকে না, একেবারে অপরিচিত অন্য একটা মানুষ হোয়ে যায়। শম্ভুদার ছেলে বৌ নাতি, বাড়িঘর সব আছে।

কানুর সঙ্গে তার আর কি?

মুখ তুলে বলে,

"হঠাৎ যদি পথের ধারে এক তোড়া একশো টাকার নোট পেয়ে যাও, তা হোলে কি হয় শম্ভুদা?"

শম্ভু চমকে উঠে ফিরে বলে,

"কোন একতোড়া একশো টাকার নোটের কথা বলছিস, কেনো? ঐ পকেট-কাটার টাকা নাকি? তুই তার কি জানিস্?"

ওর রাগ দেখে কানু ঘাবড়ে আমতা-আমতা করতে থাকে।

"না, মানে, তুমি যদি পথের ধারে একতোড়া নোট কুড়িয়ে পাও, তাকে তো আর চুরি বলে না।"

"চুরি বলে না মানে? চোরাই মাল জেনে শুনে গাপ্ করব, আর তাকে চুরি বলব না? বাঃ, বেশ বললি তো!"

"আহা, চোরাইমাল তুমি কি করে জানলে?"

"না, চোরাইমাল নয়! ব্যাঙের ছাতার মতো পথের ধারে আপনি গজিয়েছে! ওসবের মধ্যে নাক গলাস্নি কেনো, এখন থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। চোরাইমাল নয় তো কি? পথে একতোড়া নোট পেলেই বুঝব আজ দুপুরে যে পকেট-কাটাকে তাড়িয়ে এখানে এনে, তাকে ধরে পকেট খোঁজা হয়েছিল, সেই সবার নজর এড়িয়ে কোন্ ফাঁকে নোটের তাড়া ফেলে দিয়েছিল, বমাল ধরা পড়বার ভয়ে! আমাকে নোটের তোড়া দেখাস্ নি বলছি, কেনো, ভালো হবে না।"

কানু পাথর হয়ে যায়, বুড়োকে কেমন স্বচ্ছন্দে সব কথা খুলে বলা গেল, অথচ শম্ভুদার সঙ্গে এতদিনের আলাপ, তার কাছে মুখ খোলার উপায় নেই। শেষটা কানু বলে,

"না, মানে, কেউ যদি নোটের তাড়া কুড়িয়ে পায়, তবে সে কি সেটাকে ফেলে দেবে নাকি?"

মাথা ঘুরিয়ে কানুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শম্ভু। কানুর কান গরম হয়ে উঠে। খপ্ করে কানুর একটা হাত চেপে ধরে, অন্য হাতটা দিয়ে কানুকে ঝেড়ে ঝুড়ে খুঁজে দেখে শম্ভু। নাঃ, কানুর

পুরনো কালো ছোট্ট মনিব্যাগ ছাড়া কানুর কাছে আর কিছুই নেই। হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচে শম্ভু।

"কিছু মনে করিস্‌নি তো, কেনো? ছেলেটা অমন বয়ে গেল কিনা, সেই ইস্তক চোরাইমালকে বড় ভয় করি। এদিককার অনেককে ধরে নিয়ে গেছে জানিস, কানু? যে-ই রোজগারের কোনো উপায় দেখাতে পারছে না, তাকেই ধরছে। তাই তো পুঁটেটার জন্য ভাবনা হয়। সবাই কি বলছে জানিস্? বলছে নাকি কেউ ভেতর থেকে খবর দিচ্ছে, তাই অমন টপাটপ ধরছে!"

কানু চুপ করে থাকে। শম্ভু আবার বলে,

"কথা কচ্ছিস্ না যে বড়? তোর কি মনে হয় না পাড়ার কেউ সবাইকে ধরিয়ে দিচ্ছে?"

কানু বলে,

"কে আবার ধরিয়ে দেবে? সবাই তো বহুকালের জানাশোনা লোক।"

"কেন, তোর বন্ধু ঐ বুড়ো? ওকে কেই বা জানে শোনে? কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল। দুপুরের ওষুধের দোকান বিকেলে ঘড়ির দোকান হয়ে যায়, এরকম তো জন্মে কেউ শোনেনি! ও-ই হয়তো সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে, তারপর ধরিয়ে দিচ্ছে! নইলে তোর সঙ্গেই বা অত ভাব জমাবার কি আছে?"

কানুর গলা বন্ধ হয়ে আসে,

"না, শম্ভুদা, না। ও সেরকম লোকই নয়, ও দেশে যাবার জন্য টাকা জমাচ্ছে, তাই দুটো দোকান, তাতে ডবল লাভ। তুমিও তো বাড়ি সারাবার জন্য টাকা জমাও, তোমার পেয়ারের পুঁটিরামই তো বলে, তুমি একটা কেপ্পনের জাস্থ—"

এই অবধি বলতেই ঠাস্ করে শম্ভু কানুর গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়।

দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে যায়, হাঁ করে এ ওর দিকে চেয়ে থাকে। কানুর দু-চোখ জ্বালা করতে থাকে, হাত কাঁপে। অদ্ভুত একটা স্বর বেরোয় গলা থেকে, বলে,

"তুমি আমাকে মারলে, শম্ভুদা ?"

শম্ভু চেঁচিয়ে বলে,

"মারব না ? একটা যা-তা লোকের সঙ্গে মিশে একেবারে গোল্লায় যেতে বসেছিস্, মারব নাতো কি মাথায় করে নাচব নাকি ?"

কিছুতেই কানু চুপ করে থাকতে পারে না, বলে,

"বারবার বলছি ও ভালো লোক, ওধরনের লোকের সঙ্গে তুমি মেশোনি তাই বোঝ না।"

"ভালো লোক না আরো কিছু! সব শুনেছি, কানু, আমি আজ জন্মাই নি। তুই-ই সব নষ্টের গোড়ায়, তোর সঙ্গে ভাব জমিয়ে, তোর কাছ থেকেই সব কথা বের করে নিয়েছে, নইলে এতকাল পরে পুঁটের দলের সর্দার ধরা পড়ে কি করে? পুঁটে এখন প্রাণের দায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

কানু আর শুনল না, দুহাতে কান চাপা দিয়ে সেখান থেকে চোঁ-চোঁ দৌড় লাগাল। গলি ছেড়ে বড় রাস্তায়, বড় রাস্তা ছেড়ে আবার গলিতে। অন্ধকার থেকে পুঁটিরাম বেরিয়ে এসে ডাকে, "এই কানু!"

কানু থমকে দাঁড়ায়,—কি ? পুঁটিরাম আবার কি চায় ?

পুঁটিরাম বলে :

"ছাখ্, কানু, ছাখ্, শম্ভুদা লটারি জিতে ন'শো টাকা পেয়েছে। আমার কাছে টিকিটটা ছিল, এই ছাখ্ নিয়ে এসেছি।"

কর্কশ গলায় কানু বললে,

"এনেছিস তো ওকে দিচ্ছিস্ না কেন ? গাপ্ করবার তালে আছিস্ নাকি ?"

পুঁটিরাম আকাশ থেকে পড়ল,

"এর চেয়ে আমার গালে দুটো চড় মারলেই পারতিস্ কেনো! নিয়েছি আমি কোনোদিন আমার বন্ধুদের কাছ থেকে? দিচ্ছি না, তার কারণ ওদিকে ধরপাকড় চলছে কিনা জানিনে, সর্দারকে ধরেছে জানিস্ তো?"

কানু বললে, "জানি—কিন্তু এখন ওদিকে কেউ নেই, স্বচ্ছন্দে যেতে পারিস্।"

পুঁটিরাম দু' পা এগিয়ে বলে,

"চ', আমার সঙ্গে চ' না।"

কানু মাথা নাড়ে। গালের ওপর শম্ভুদার চড়টা যেন চড়চড় করতে থাকে, এখন আর শম্ভুদার কাছে যাওয়া যায় না। বললে,

"না, আমার কাজ আছে, তুই এক্ষুণি যা।"

আর দাঁড়ায় না কানু, এদিক ওদিক যেখানে সেখানে ঘোরে, শেষটা অনেক রাতে হালদারদের সেই পুরনো পুকুরটার পাড়ে গিয়ে পৌঁছোয়, সর্বাঙ্গে তখন ব্যথা, মাথা টিপটিপ করছে, চোখ জ্বালা করছে।

ভাঙ্গা ঘাটের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ে কানু। মনে হয় লাল বাড়ির দেয়ালের ছায়া ছেড়ে কতকালের মধ্যে কোথাও ঘুমোয়নি। মনে হয় লালবাড়ি থেকে যেন কতদূরে চলে এসেছে। লালবাড়ির ছোট ছেলেটার উপর কতকালের পুরনো রাগটাও কখন একেবারে পড়ে গেছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কানু ভাবতে লাগল, আগে মনে হোত বড়লোক হওয়া ভারি সহজ। একগাদা টাকা থাকলেই বড়লোক হওয়া যায়। আজ কেমন সন্দেহ হোতে লাগল সত্যিই কি তাই? লালবাড়ির ছেলের বাবার ঠাকুরদা কত না কষ্ট করে, কত বছর ধরে খেটে খুটে একটু একটু করে বড়লোক হয়েছিল। তারপর তার ছেলে

লেখাপড়া শিখে আরো বড়লোক হল, তার ছেলে আরো লেখাপড়া শিখল, তারই ছেলে ঐ লালবাড়ির ছোট ছেলেটা, কানু কি আর রাতারাতি তার মতো হোয়ে যেতে পারে ?

কি রকম দেখতে ছিল সেই বুড়ো, কে জানে ? হয়তো ঐ রকম সুন্দর ফর্সা ছিল না। কে জানে হয় তো কানুর মতো দেখতে ছিল। জাহাজের মাল গুণে তুলত, কিছু ভালো কাপড়-চোপড় ছিল না নিশ্চয়ই। থাকত কোন্ এঁদো গলিতে, তার চেয়ে লালবাড়ির রোয়াকে শোয়াটাই বা কি এমন মন্দ ?

আস্তে আস্তে মনটা ঠাণ্ডা হোয়ে আসে কানুর, গায়ের জ্বলুনিটাও সেরে যায়। পুকুরের ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস দেয়, চোখ বুঁজে কানু ভাবে, সেও বড়লোক হবে, তবে ঐ ছেলেটার মতো হোতে পারবে না, ঐ বুড়োর মতো হবে, ওর ঠাকুরদার বাবার মতো। ভারি হাসি পায় কানুর, ছেলেটার ঠাকুরদার বাবার মতো হোতে হবে ভেবে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে নিজেই টের পায় না। ঘুম ভাঙ্গে পাঁচিলের ওপর থেকে শালিকপাখির কিচিমিচি শুনে।

চোখ খুলেই প্রাণটা চা চা করে ওঠে। কানু উঠে পড়ে পুকুরের জলে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। বাঃ, শরীরটাকে একেবারে হালকা বোধ হয়। এবার একটু গরম চা পেলে হোত। অমনি চা-ওলার কথা মনে পড়ে। সে হয়তো ভাবছে আজকে তার বাঁধা-খোদ্দের কানুর কি হোল !

চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে থাকে কানু, শম্ভুদার কাছে কোনো মতেই আর যাওয়া যায় না। আস্তে আস্তে নিজের গালে হাত বুলায় কানু। গালে আর চড়ের জ্বালা নেই, কিন্তু প্রাণের মধ্যে গিয়ে চড়টা লেগেছিল। সে জ্বালা এখনো যায় নি ! শম্ভুদা মিছিমিছি মেরেছিল কানুকে।

এতক্ষণে পুঁটিরামের কাছ থেকে টাকা পেয়ে শম্ভুদা নিশ্চয় খুশি হয়ে গেছে! এবার তার দেশের বাড়ি সারানো হবে। ওর বাপ ঠাকুরদার বাড়ি, আম-কাঁঠাল গাছ আছে। পুকুর আছে, শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো ঠাকুরঘরের জানালায় লাল নীল কাঁচ বসানো, তার মধ্যে দিয়ে রোদ এসে সাদা মেঝের ওপর নাকি রং-বেরঙের নক্সা কাটে। বাড়ি সারিয়ে গোয়ালঘরে থাকবে শম্ভুদা, সেটা নাকি পরে হয়েছিল, তাই বেশি ভাঙেনি।

পুঁটিরামকে নিয়ে যেতে চায় শম্ভুদা, অন্য সময় হোলে পুঁটে কলকাতা ছেড়ে স্বগ্‌গেও যেত না, কিন্তু এখন দল ভেঙ্গে গেছে, গেলেও যেতে পারে। তাছাড়া পুঁটেও আজকাল একটু অন্যরকম হোয়ে গেছে। পারলে হয়তো বেহার শরিফে নিজের মা বাবার কাছেই ফিরে যেত! তবে সেখানে নাকি খালি হাতে যাওয়া যায় না, এ রকম পোড়া কাঠ শরীর নিয়েও যাওয়া যায় না। শম্ভুদার কাছে দু'চার মাস থাকলে শম্ভুদার বাড়িও সারানো হবে, পুঁটিরামেরো চেহারা ফিরবে। যাবে তখন সে বেহার শরিফে, বাপের সঙ্গে দোকান দেখবে। শম্ভুদাও নাতি নিয়ে সুখে থাকবে, ওর বৌমা নাকি ভারি ভালো রাঁধে। শম্ভুদা যখন ওদের দেখতে যায়, ওকে রেঁধে খাওয়ায়।

কানুর সঙ্গে ওর কি?

কানু উঠে পড়ে ভাবে তার চেয়ে কেন বুড়োর বাড়ি গিয়ে একটু "ছুরপি" দিয়ে, চা খায় না? যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ।

এক দৌড়ে কানু গিয়ে বুড়ো দোকানের সামনে হাজির। গিয়েই ভাবে একি ভেল্কি নাকি? সব ভোঁ ভোঁ। কেউ কোথাও নেই, খালি ঘর খাঁ খাঁ করছে! দোকান নেই, দোকানের আসবাব নেই, ঘড়ি নেই, শুকনো পাতার গোছা, ওষুধের শিশি কৌটো, কিচ্ছু নেই। জিনিস নেই, দোকান নেই, দোকানের মালিক নেই, দোকানের

মালিকের লোহার সিন্দুক নেই, লোহার সিন্দুকের ভেতর মণিব্যাগে ঠাসা কানুর তোড়া তোড়া একশো টাকার নোট নেই !

৯

রাতারাতি ভেল্কিবাজির মতো সব উড়ে গেল ! তাই কখনো হয় নাকি ? একবার চোখ বুঁজে, আবার তখুনি চোখ খুলে দেখে কানু। নাঃ, সত্যি খালি দোকানঘর খাঁ খাঁ করছে ! মেঝেটাতে ধুলো ময়লা, তার ওপর বুড়োর তেলের উনুনের দাগ দেখতে পায় কানু। বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে।

তবে কি শম্ভুদার কথাই ঠিক ? ও কি তবে টিকটিকি নাকি ? লুকিয়ে দোকানদার সেজে পাড়ার সব খোঁজ খবর করে, তারপর সবাইকে ধরিয়ে দিয়ে, নিজেও হাওয়া ! নাকি কানুর অতগুলো টাকা একসঙ্গে হাতে পেয়ে লোভ সামলাতে পারে নি, তাই নিয়ে দেশে কেটে পড়েছে ?

বুড়োর মুখটা মনে পড়ে কানুর, কি সুন্দর কথা বলে, চোখ দিয়ে কেমন হাসে, ও কি কখনো অত খারাপ হোতে পারে নাকি ? দেয়ালের সামনে সরু র‍্যাকে ওষুধপত্র রাখত, চওড়া দেয়াল-ঠেসা আলমারিতে ঘড়ি রাখত, তার একটাও কি থাকতে নেই ! 'ছুরপি' গুলোও নিয়ে গেছে, ডাক্তির শিশিটাকেও ভোলে নি !

পা দুটোতে জোর পায় না কানু, কাল রাতে রেগেমেগে খায় নি, আজ সকালেও চা খাওয়া হোয়ে ওঠেনি ! নিজের পা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে কানু ; রোগা, কালো, নখ-ভাঙ্গা ! হাত দুটোকে দেখে, ময়লা, কালো কালো নখ ! বড়লোকেদের কখনো এরকম হাত পা হয় ? যাদের কুড়িয়ে পাওয়া টাকা অন্য লোকে নিয়ে নেয়,

তারা আবার বড়লোক কিসের? যারা টাকাকড়ি কুড়িয়ে পায় তারা আবার বড়লোক নাকি? কে না জানে ও চুরির টাকা! ঐ টাকা নিয়ে কানু বড়লোক হবে ভেবেছিল নাকি!

খালি দোকানঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার টিপকলে খুব ভালো করে আরেকবার হাত পা ধোয় কানু। তারপর এক দৌড়ে শম্ভুদার কাছে।

শম্ভুদার কাছে আবার কি? কোথায় শম্ভুদা? শম্ভুদার ঘরের দোরে এই বড় তালা ঝুলছে।

চা-ওলা এসে লটবহর নামিয়ে বসে, ইস্, কত ভোরে আজ কানু উঠেছে। ব্যাপার কি?

"আচ্ছা নকুড়দা, শম্ভুদা কোথায় বলতে পারো?"

চা-ওলা কিছুই জানে না, কাল বিকেলে শম্ভুদা ঝালমুড়ি কিনেছিল, তারপর চা-ওলা আর এদিকে আসেনি। সে জানবে কি করে?

কানু এক ভাঁড় গরম চা'র সঙ্গে কয়েকটা বাঁদরবিস্কুট খায়। সত্যি, কি ভালো খেতে। আরেক ভাঁড় চায়ের সঙ্গে আরো কতকগুলো বিস্কুট খায় কানু। শম্ভুদা এত ভোরে গেল কোথায়? আসে না-ই বা কেন? ওর দোকানে কানুর জুতো পালিশের বাক্স বন্ধ, বেশি দেরি করলে কানুর সকালের খোদ্দেররা সব হাতছাড়া হয়ে যাবে।

সামনে পানের দোকানে গিয়ে ওদের জিগগেস্ করে কানু। পান-ওলা ওকে দেখে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কাল অনেক রাতে শম্ভু ওকে ডেকে তুলে ঘরের চাবি দিয়ে গেছে, বলেছে কানু এলে তাকে দিতে। কেন, কি জন্য অত কথা পান-ওলা জানে না, চাবি ফতুয়ার পকেটে গুঁজে সে আবার তক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়েছিল।

চাবি নিয়ে কানু আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এসে, তালা খোলে। ঘরের দরজাও অমনি হাঁ হোয়ে খুলে যায়।

অবাক হোয়ে চেয়ে দেখে কানু, পরিষ্কার তকতক করছে ছোট্ট ঘরটি। বইগুলো থাকে থাকে গুছিয়ে রাখা, তক্তাপোশে পরিপাটি করে মাদুর পাতা। তার ওপর একটা ভাঁজ-করা চিঠি।

কানুর বুক টিপটিপ করতে থাকে। চিঠি লিখেছে কেন শম্ভুদা? চিঠি খুলতে হাত কাঁপে। কাগজ খড়মড় করে ওঠে। শম্ভুদা লিখেছে,

ভাই কানু, পুঁটিরাম ও আমি গেলাম, আর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমার দোকানটি তোমাকে দিয়ে গেলাম। ঐ থেকেই একদিন বড়লোক হোয়ো। ইতি। শম্ভুদা।

পাগলের মতো ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে কানু, শম্ভুদার ব্যবহারের জিনিসপত্র কিচ্ছু পড়ে নেই। তার কাপড়চোপড়, জুতো, ছাতা, টিনের তোরঙ্গ, থেলো-হুঁকো, সব নিয়ে গেছে শম্ভুদা। পরিষ্কার ঝরঝরে দোকানটি দিয়ে গেছে কানুকে, বই বেচে কানু যাতে একদিন বড়লোক হোতে পারে।

চোখভরে জল আসে কানুর, তক্তাপোশটার ওপর মুখ গুঁজে খানিকটা কেঁদে নেয়। বুড়ো নেই, শম্ভুদা নেই, পুঁটে নেই, কানুর তবে আছে কে?

নরম গরম কি একটা গা ঘেঁষে বসে, মোলায়েম ভিজে জিভ দিয়ে কে কানুর কান চাটে। চমকে মুখ তুলে কানু দেখে ভুলো কুকুরটা কখন এসে ঘরে ঢুকেছে! অমনি কানুর বুকটা ভরে ওঠে। কেউ নেই আবার কি? এইতো ভুলো রয়েছে, এখুনি খাই-খাই লাগাবে। তক্তাপোশের তলা থেকে জুতো পালিশের বাক্সটা টেনে বের করে, তার খোপের মধ্যে থেকে চারটে পয়সা বের করে কানু, চারটে পয়সার লেড়ুয়া বিস্কুট ভুলো এক মিনিটে খেয়ে সাবাড় করে! ব্যাটাকে পুষতে হোলে কানুকে তো দ্বিগুণ খাটতে হবে দেখা

যাচ্ছে। একগাল হেসে ভুলোকে একটা ছোট ঠেলা মারে কানু। ভুলোটাও অমনি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একাকার।

জুতো পালিশের বাক্সটা উঁচু তাকের ওপর তুলে রাখে কানু, কাউকে দিয়ে দিতে হবে। দোকান দেখতে হলে ওসবের আবার সময় কোথায়? তাছাড়া—কানু তো এখন বই-এর দোকানের মালিক, ওদিয়ে তার কি হবে?

আঠার শিশি আর পাতলা তেলা-কাগজ নিয়ে ছেঁড়া বই জুড়তে বসে কানু। কাজ করে আর আকাশ পাতাল ভাবে। শম্ভুদা এতক্ষণে পুঁটেকে নিয়ে নিশ্চয় দেশে পৌঁছেছে তারপর নাতিকে আর তার মাকে আনবে, ঘর-দোর পরিষ্কার করে, অমনি সারাতে লেগে যাবে। ভাগ্যিস লটারির টাকাগুলো পেয়ে গেল।

কার একটা ছায়া এসে কানুর হাতের ওপর পড়ে। চোখ তুলে অবাক হোয়ে দেখে লালবাড়ির ছোট ছেলেটা, সাদা হাত-কাটা জামা আর ইজের পরে দাঁড়িয়ে আছে, মুখটা ভারি হাসি-হাসি মনে হয়।

কানু ব্যস্ত হোয়ে ওঠে, "কিছু দরকার ছিল কি?"

ছেলেটা বলে, "কাল শম্ভুদা এরোপ্লেনের বই দেখিয়েছিল, সেইটে কিনতে এসেছি।"

এই বলে একটা চকচকে আধুলি রাখে তক্তাপোশের ওপর। বইটা কানুর জানা বই, অমনি তাকে নামিয়ে ওর হাতে দেয়।

"এই নাও, খুব ভালো বই।"

ছেলেটা বই নিয়ে কিন্তু চলে যায় না। আস্তে আস্তে দোকানে উঠে, তক্তাপোশের কোণায় বসে। বলে,

"ইস্, কত বই তোমাদের দোকানে! শম্ভুদা কোথায়?"

কানু বলে, "সে দেশে গেছে। আমাকে দোকানটা দিয়ে গেছে।"

বলতে গিয়ে আনন্দে মুখ ঝলমল করে ওঠে কানুর। ছেলেটা বলে,

"ইস্! এই দোকানটা তোমার? আমি মাঝে মাঝে এসে বই দেখব কিন্তু। বই কিনব মাঝে মাঝে। কেমন?"

আস্তে আস্তে উঠে পড়ে ছেলেটা, কানু হাসিমুখে তাকে বিদায় দেয়।

ক্রমে বেলা বাড়তে থাকে, লালবাড়ির ছায়াটা ছোট হোতে হোতে বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। কানুর আজ অনেক-বই বিক্রি হয়েছে। বেলা বারোটায় দোকান বন্ধ করে, ভুলোকে ডেকে নিয়ে বাঁশতলা কেবিনে গিয়ে ওঠে।

মালিককে বলে,

"ধরুন, আপনার জন্যে ছাঁচি পান এনেছি।"